২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫

নির্দেশক ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-100116
দ্বারা প্রকাশিত এবং লয়াল আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, 164, লেনিন সরণী,
কলকাতা-700013 থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

পাঞ্জাবী নাটক ও মঞ্চ পাঞ্জাবের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের দ্বিতীয় পর্যায়ের দান। পাঞ্জাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রোপিত হয় পুনর্জাগরণের বীজ। পাঞ্জাবে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ শুরু হয় মধ্যযুগে ইসলামের অনুপ্রবেশ ও শিখধর্মের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। এ সময়ে পাঞ্জাবে ধর্ম, দর্শন, কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং বাস্তুশিল্পের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী আন্দোলন আরম্ভ হয়, কিন্তু দৃশ্যশিল্পের পর্যায়ভুক্ত নৃত্য ও নাটক উপেক্ষিতই রয়ে যায়। দর্শন, কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং বাস্তুশিল্পে প্রেরণাস্বরূপ কাজ করেছিল ধর্ম, রাজ্য নয়। সেইজন্যেই এসব ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বিকাশে ধর্মের ছাপ ছিলো গভীর। পাঞ্জাবের ইতিহাসের মধ্যভাগে নাটক প্রসঙ্গে ইসলাম অথবা শিখ কোনো ধর্মই বিশেষ উৎসাহিত ছিল না। এমনকি শিখ গুরুরা 'নাটক-চেটক'কে 'কুকাজ' হিসেবে গণ্য করতেন।

সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্যের ভগ্নশেষ দীর্ঘকাল পাঞ্জাবে লোকনাট্য হিসেবে বেঁচে ছিল—এদের মধ্যে ছিলো স্বাঙ্গ, নকলেঁ, রাসলীলা ইত্যাদি। গুরু-শিষ্যের স্বাঙ্গ এবং কৃষ্ণ ও রামলীলার প্রচলন করেছে গুরু নানকের রচনাবলীই :

> " বাইন চেলে নচনি গুরু
> পৈর হিলাইন ফেরনি শির
> উড়ি উড়ি রাওয়া ঝাটে পায়ে।
> বেখে লোক হাসে ঘর যায়ে।
> রোটিয়া কারণি পুরহি তাল।
> আপ পছাড়ি ধরতি তালি।
> গাওনি গোপিয়াঁ গাওনি কান্হ।
> গাবন সীতা রাজে রাম।
> নাচ্চন কুদন মনকা চাও
> নানক জিন মনি ভউ তিন্হা মনি ভাও।"

অর্থাৎ নাটকে যেমন নেঁচে কুঁদে, গান গেয়ে, মাটীতে আছাড় খেয়ে নট নিজে ভক্তিরস দেখায় তেমনি এই পৃথিবীতেও বহু গুরু চেলা আছে যারা সত্যিকার ভক্ত নয়, কেবলই ঐ রকম অভিনয় করছে। লোকে তাঁদের দেখে হেসে ঘরে চলে যায়। এতে এদের ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না।

রাজাশ্রয় বঞ্চিত, ধর্মের অঙ্গনে অবহেলিত পাঞ্জাবের লোকনাট্য অনাদরে বেঁচে ছিল ফলে ক্রমবিকাশ হয়নি এর। সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে এই নাট্যকলার কোনো যোগ ছিল না, কেউ যোগস্থাপনের চেষ্টাও করেননি কোনো দিন। এইসব কলাকৃতির সামাজিক মানও ছিল নীচে। এমনকি ভাণ্ড, মিরাসি, কলোঁত ও রাসধারীদের থেকেও নিম্নস্তরের বলে এদের গণ্য করা হ'ত। বৃটিশশাসন কায়েম হওয়ায় এবং পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার ফলে পাঞ্জাবে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ না হওয়া পর্যন্ত এই রীতিই প্রচলিত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্ম হয় নবজাগরণের দ্বিমুখী ধারার। তার একদিকে ছিলো আধুনিকরণ, অন্যদিকে পুনর্স্থাপনাবাদী রীতি। ইংরেজের ভারত আগমনের প্রায় দু'শতাব্দী পরে এবং ভারতে বৃটিশ-শাসন কায়েম হওয়ার এক শতাব্দী পরে পাঞ্জাব বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত হয়। এই জন্যেই ভারতীয় সাংস্কৃতিতে পশ্চিমী সভ্যতাকে গ্রহণের প্রচেষ্টা চলছিলো একদিকে, অন্যদিকে চেষ্টা চলছিলো প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিকে নতুন করে অনুধাবনের। প্রথম ধারা আধুনিকরণের, দ্বিতীয়টি পুনর্স্থাপনাবাদের।

পুনর্স্থাপনাবাদী স্রোতের প্রভাবেই প্রথম পাঞ্জাবীতে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ শুরু হয় এবং সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেই রচিত হতে শুরু করে মৌলিক নাটক। অনুবাদকের মধ্যে ডঃ চরণ সিং (কালিদাসের 'শকুন্তলা') এবং মান সিং (বিক্রমোর্বশী) এর নাম উল্লেখযোগ্য। ভাই বীর সিং (1872—1957), বাবা বুদ্ধ সিং (1881—1931), বৃজলাল শাস্ত্রী (জঃ 1891) এবং লালা কৃপা সাগর (1872—1939) প্রমুখরা সংস্কৃত নাটক অনুসরণে মৌলিক নাটক রচনা করলেও সেগুলি কেউ মঞ্চাভিনয়ের কোনোরকম চেষ্টাই করেননি

সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রাচীনকালে একাঙ্ক নাটক রচিত হয়েছে। ভাস রচিত একাঙ্ক 'দূতিবাক্য' ও 'উরুভঙ্গ' এবং রাজা মহেন্দ্র বর্মণ রচিত একাঙ্ক 'ভগবদ্ অজ্জুকে' ও 'মতবিলাস' ইত্যাদি নাটকে এর ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সংস্কৃত নাটকে পাঞ্জাবী অনুবাদকরা অথবা মৌলিক নাট্যকাররা নাট্যরচনার এইদিকে কোনোরকম উৎসাহ প্রকাশ করেন নি।

আসল কথা হলো, লোকনাট্যের ধারাকে পরিত্যাগ করে সাহিত্য-ধর্মী নাটক রচনা এবং তাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করার প্রচলন একাঙ্ক নাটকের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিলো এবং পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনু-প্রবেশ ও একাঙ্ক নাটকের সূত্র ধরেই হয়েছিলো। 1933 সালে পাশ্চাত্য রীতিতে রচিত ও অভিনীত প্রথম পাঞ্জাবী নাটক 'ডুলহ্ন' (সোহাগ) ছিলো একটি একাঙ্ক। এটির রচয়িতা ছিলেন লাহোরের দয়াল সিং কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র ঈশ্বর চন্দ নন্দা। ইনি নাট্যরচনার, প্রযোজনার এবং অভিনয়ের অনুপ্রেরণা লাভ করেন কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপাল পি. আই. রিচার্ডসের পত্নী শ্রীমতী নোহার রিচার্ডসের কাছ থেকে। বলবন্ত গার্গী যথার্থই শ্রীমতী রিচার্ডসকে পাঞ্জাবী নাটকের পিতামহী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে শ্রীমতী রিচার্ডসের প্রেরণার নিদর্শন হিসেবেই এখানে আধুনিক রীতি-প্রকৃতি অবলম্বন করে নাটক লেখা এবং পরিবেশন করার চেষ্টা চলতে থাকে। সুখের কথা, এই প্রারম্ভিক সফল প্রচেষ্টা পূর্ণ স্বীকৃতি-লাভ করে পাঞ্জাবী দর্শকদের এবং তার ফলেই পশ্চিমী রীতির বহুমুখী নাট্যশৈলীও উৎসাহ পায়। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জাবী নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। এই সময় পাঞ্জাবী নাট্য আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী এবং উত্তর ভারতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার কেন্দ্র লাহোর।

পাঞ্জাবী একাঙ্ক নাটকের বিকাশের দ্বিতীয় প্রধান পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় 1940-এ। লাহোরকে কেন্দ্র করেই এই আন্দোলন গড়ে উঠে। লাহোর এই সময় শুধুমাত্র পাঞ্জাবের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক

ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্রই ছিলো না, শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক পুনর্জাগৃতির দুর্গই সেখানে গড়ে উঠেনি— লাহোরকে কেন্দ্র করেই অমৃতসর, প্রীতনগরের পাঞ্জাবী সাহিত্য প্রচেষ্টার মূল ধারাগুলিও প্রবাহিত হচ্ছিল। এই সময়ে লাহোরে রেডিও স্টেশন স্থাপনের ফলে এখানে পাঞ্জাবী সাহিত্য অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস, সমীক্ষা, কাব্য, সঙ্গীত এবং নাটকের বিকাশ দ্রুততর হয়ে উঠে। লাহোর রেডিওর ভাষা-মাধ্যম প্রধানতঃ উর্দু হলেও পাঞ্জাবী ভাষার জন্যেও যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো—ফলে পাঞ্জাবী নাট্যকার, কবি-সাহিত্যিক এবং আলোচকরা এক নতুন মাধ্যমের সুযোগ পান। এই মাধ্যমের সবচেয়ে বড়ো সুবিধে হলো লিখিত সাহিত্যের তুলনায় রেডিওর মাধ্যমে প্রসারিত সাহিত্য শ্রাব্য হওয়ার ফলে পাঞ্জাবী জনতার এক বড়ো নিরক্ষর অংশ এই রস গ্রহণের সুযোগ পেলো।

লাহোর রেডিও স্টেশনের নিরন্তর চাহিদার ফলে এই নগরের পরিশ্রমী এবং সাহসী এ্যামেচার নাট্যমণ্ডলীগুলি, আহমদ শাহ বুখারীর রাজকীয় কলেজ, লাহোরের ড্রামাটিক ক্লাব, প্রিন্সিপাল জি. ডি. সোন্ধীর পরিচালনায় ওপ্‌ন এয়ার থিয়েটার এবং লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ইত্যাদির নাট্যকর্ম, প্রীতনগরে সর্দার গুরবক্স সিং স্থাপিত আদর্শবাদী নাট্যলীলা লহর এবং অমৃতসরের খালসা কলেজে প্রতিভাশালী মৌলিক সাহিত্যিকরা মিলে পাঞ্জাবী একাঙ্ক নাটিকা এবং পাঞ্জাবী সাহিত্য ও মঞ্চে এক গৌরবময় যুগের সূচনা করলেন। এই সময়েই পাঞ্জাবী রেডিও নাট্যকলার বিখ্যাত সাধক রফী পীর-এর দেখা মেলে। রফী পীর পাশ্চাত্যে গিয়ে রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর নাটক 'অক্‌খিয়াঁ' ও 'বৈরী' সমকালীন চিন্তা, সুন্দর সংলাপ, তীব্র এবং গভীর নাটকীয় সংঘাতের গুণে এবং রেডিও মাধ্যমে পরিবেশনার সবল প্রচেষ্টা কেবলমাত্র পাঞ্জাবী নাটকের ক্ষেত্রেই নয়, হিন্দী ও উর্দু নাটকের ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম বলে চিহ্নিত হয়েছে। 1940 সালেই সন্ত সিং সেখোঁ রচিত সম্ভবত প্রথম পাঞ্জাবী একাঙ্ক সংকলন 'ছে ঘর' প্রকাশিত হয়। প্রায় এই সময়েই সর্দার গুরবক্স সিং-এর বড় একাঙ্ক 'প্রীত মুকট', 'হোনী দা লিশকারা' এবং 'প্রীতমণি' রচিত এবং

প্রীতনগরের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। হরচরণ সিং রচিত প্রথম একাঙ্ক সংগ্রহ 'জীবনলীলা' প্রকাশিত হয় 1940 সালে এবং 1945 সালে প্রকাশিত হয় বলবন্ত গার্গীর প্রথম একাঙ্ক সংকলন 'কুঁয়ারী টীসী'।

পঞ্চম দশকের প্রথম সাত বছর পাঞ্জাবী একাঙ্ক নাটক বিকাশের ক্ষেত্রে স্মরণীয়। এই সময়েই নতুন মৌলিক নাট্যপ্রতিভার উদয় হয়। পাঞ্জাবী এ্যামেচার থিয়েটারের প্রসারও হয় এই সময়ে এবং নাটকের শৈল্পিক অভিব্যক্তির জন্যে পাঞ্জাবী নাট্যকলা পেল নতুন সম্ভাবনায় ভরা রেডিওর মাধ্যম। এই সাত বছর ধরে যে সমস্ত নাট্যকারদের পরিচয় পাওয়া গেল তাঁদের দানেই পাঞ্জাবী নাটক সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বলে ধরা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন সন্ত সিং সেখোঁ, হরচরণ সিং, বলবন্ত গার্গী, কর্তার সিং দুগ্‌গল ইত্যাদি। এখনও পর্যন্ত এঁরা তাঁদের উত্তরসূরীদের থেকে বেশী না হলেও সমানই সক্রিয় রয়েছেন। যদিও এইসব নাট্যকাররা তাঁদের পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মতন পূর্ণ নাটকের রূপ সাধনা করেছেন তবুও বিশেষ করে এই সময়ে এঁদের অবদান বিশেষ করে স্মরণীয়। 1913-14 সাল থেকে শুরু করে একাঙ্ক নাটকের প্রয়োগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সাহিত্যধারা ও মঞ্চকলার সম্ভাবনাকে আরও বাস্তবায়িত ও পুষ্ট করেছেন এঁরা।

1947 সালে দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু ভারতীয় পাঞ্জাব থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো লাহোর—কয়েক শতাব্দীর পুরোনো রাজধানী, সমস্ত রকম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। পূর্ব-পাঞ্জাবে এমন কোনও স্থান ছিলো না যেখানে লাহোরের সমস্ত সাংস্কৃতিক সংস্থানগুলি পুর্নস্থাপিত হতে পারে। সোলন, সিমলা, হোশিয়ারপুর, অমৃতসরের বিভক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কি পরিণতি হলো বলা শক্ত। রাজধানী প্রথমে জলন্ধর এবং সিমলাতে রইলো, পরে এলো চণ্ডীগড়ে। রেডিও স্টেশন এবং উর্দু ও পাঞ্জাবী সংবাদপত্রের আবাসস্থল হয়ে উঠলো জলন্ধর। বহু জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত কারণে লাহোরের সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ধারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে লাগলো। এই উথাল-পাতাল পরিবর্তনের ফলে পাঞ্জাবের সাংস্কৃতিক জীবনে এক গভীর ছাপ পড়ে।

ভারতীয় পাঞ্জাবে লাহোরের অপূর্ণতা আজ অবধি পূর্ণ হয়নি। তার ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, বৈচিত্র্য, নাগরিক আচার-ব্যবহার, কুশলতা, সূক্ষ্মতা ও জটিলতা, রাজনৈতিক ও অর্ধরাজনৈতিক আন্দোলন ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক ব্যস্ততা, শিক্ষামূলক ও যুব আন্দোলন এবং এমনি আরও অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ এই নগরকে যে বিশিষ্ট আসনে স্থাপিত করেছিল তার সমকক্ষ পাঞ্জাবে কোনো শহর তখনও ছিলো না, হয় তো ভবিষ্যতে হবেও না। চারুকলা, সাহিত্য ইত্যাদির থেকে নাটকের স্থান এখানে ভিন্নতর, নাটক নিতান্ত ব্যক্তিগত সাধনা বা শিল্পসৃষ্টি নয়। এর স্থান নদীতীরে অরণ্যে বা অন্য নির্জন জায়গায় নয়। জনতার মধ্যে, ঠেলাঠেলি ভীড়ে এর জন্ম, বেড়ে উঠে ও শক্তি সঞ্চয় করে ওখানেই। এর বৈশিষ্ট্যই হল, এ এক সামগ্রিক নাগরিক শিল্প। এই জন্যেই লাহোর থেকে ছিন্নমূল হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত যদি নাট্যশিল্প পাঞ্জাবে শিকড় না গেড়ে থাকতে পারে, তাহলে দোষ দেওয়ার কারণ নেই, কেননা সত্যি বলতে কি ভারতীয় পাঞ্জাবের অন্য নগরগুলি যাবতীয় নাগরিক সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকলেও সেখানে যথার্থ নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি।

দেশবিভাগের পর প্রথমে সিমলার লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ এবং তারপর দিল্লীতে গুরদয়াল সিং খোসলার চেষ্টায় পাঞ্জাবী থিয়েটার গ্রুপ পাঞ্জাবী নাটককে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে থাকেন। দিল্লীতে শীলা ভাটিয়া দিল্লী আর্ট থিয়েটারের মাধ্যমে সঙ্গীত নাটক এবং অপেরা রীতির উন্নতির জন্যে পরিশ্রম করেছেন এবং তাঁর অনুসরণেই অন্যান্য কয়েকজন শিল্পী গীতিনাট্য ও সঙ্গীত নাটকের মধ্যে নাটক ও সঙ্গীতের সহজ মিশ্রণ করে এই রীতিকে সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনের উপযোগী করার চেষ্টা করেছেন। এইসব শিল্পীদের মধ্যে তেরা সিং চন্ন, জাহাঙ্গীর বাহরলা এবং য়্যুনাইটেড থিয়েটার, ভাটিণ্ডার শিল্পীরা অন্যতম। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাঞ্জাবের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাটক আজও তার আপন আসন পায়নি। অবশ্য চণ্ডীগড়-এ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় বলবন্ত গার্গীর পরিচালনায় ইণ্ডিয়ান থিয়েটার বিভাগ এবং পাতিয়ালাতে পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয় স্পীচ এ্যাণ্ড

ড্রামা ডিপার্টমেন্ট (যার সঙ্গে হরচরণ সিং, জি. এস. খোসলা প্রমুখরা যুক্ত) স্থাপনা পাঞ্জাবে নাট্যশিল্পের বিকাশকে উৎসাহিত করার জন্যে নিয়মিত শিক্ষাদান ও আকাদেমিক অধ্যয়নের সুযোগ দিয়েছে। এরই পাশাপাশি অমৃতসরের গুরশরণ সিং এবং ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ ড্রামার শিল্পী হরপাল টিবানা এবং তাঁর স্ত্রী নীনা টিবানা নিরন্তর প্রচেষ্টার দ্বারা পাঞ্জাবে আত্মনির্ভর নাট্যসাধনার পরিবেশ তৈরী করেছেন। শ্রীমতী টিবানা নিজেও এক উঁচুদরের শিল্পী। এ কথাও সত্য যে আজকের পাঞ্জাবী নাট্যকারদের মধ্যে একজনও নেই যাঁর বয়স চল্লিশ বছরের কম এবং এঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনেই মঞ্চাভিনয়ের জন্যে নাটক রচনা করেন। এখানে নাটক এখনও মূলতঃ পড়বার জন্যেই লেখা হচ্ছে; কিন্তু যদি নাটক অভিনয়ের কোনো ব্যাপক এবং সপ্রাণ প্রচেষ্টা না থাকে যার সহায়তায় নাটকের পাঠক তার কল্পনাকে সজীব দেখতে পারে তাহলে পাঠক এবং দর্শক উভয়ের কাছেই নাটক কেবলমাত্র সংলাপের আড়ালে গল্প-উপন্যাস হিসেবেই গৃহীত হবে। পাঞ্জাবী নাটকের আজ প্রায় এ রকমই একটা অবস্থা চলছে।

পাঞ্জাবী একাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একথা কখনই বিস্মৃত হওয়া চলে না যে পাশ্চাত্য দেশে একাঙ্ক নাটক একটি বিছিন্ন শিল্প-রীতি নয়। এটি পূর্ণাঙ্গ নাটকেরই এক বিস্তার, যা নতুন রীতি-প্রকৃতি নিয়ে নাটকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়েও স্বকীয় শিল্পরীতি, আকাঙ্ক্ষা, বৌদ্ধিক শক্তি এবং সৌন্দর্য, সামর্থ্যের দৃষ্টিতে অতটা উচ্চাসন লাভ করেনি। পাশ্চাত্য দেশে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে একাঙ্ক নাটক বিকশিত হয়েছিল কোনো শৈল্পিক কারণে নয়। মূল নাটক শুরু হওয়ার আগে দর্শকের মন ভোলানোর জন্য তাঁদের মনঃসংযোগে সাহায্য করতে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে একাঙ্ক নাটকের জন্ম। নিঃসন্দেহে বলা যায় উইলিয়াম সীজত, লেডী গ্রেগরী এবং ইয়েটস-এর মতন মহান আইরিশ নাট্যকারদের সাধনাতেই আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার আন্দোলনের উপর ভিত রেখেই এই রীতি বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এ সত্ত্বেও বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে নাটকের ইতিহাসে এর স্থান এবং স্থায়িত্ব নির্ণয় করা মুশকিল।

পাঞ্জাবী নাট্যসাহিত্য মোটামুটি গদ্যসাহিত্যের পিছন পিছন চলারই চেষ্টা করেছে। অন্তত নাটকীয় ভাব অথবা ঘটনা বেছে নেওয়ার ব্যাপারে একথা সম্পূর্ণ সত্য। এ প্রসঙ্গে গল্প-উপন্যাসের মতো নাটক নিজস্ব সাহস এবং স্বচ্ছতা দেখাতে পারেনি। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও সম্ভবত অবস্থা একই রকম। এর জন্যেই পাঞ্জাবে কাব্য এবং গদ্যের তুলনায় নাটক পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি। গৌণ কারণ হিসেবে এও বলা যায় যে কবিতা-গল্প-উপন্যাস রচিত হয় ব্যক্তিগত স্তরে এবং একান্তে পাঠের মধ্যেই তা উপভোগ করা হয়। এই জন্যেই সাহিত্যে প্রায়শই বৈপ্লবিক ভাবনা এবং সামাজিক ব্যবস্থা বিরোধী চিন্তা সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নাটক অভিনীত হয় জনসাধারণের সামনে এবং ভীড়ের মধ্যে দর্শক এই সব তথ্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না, পরোক্ষভাবে সে সব জেনেই আনন্দিত হয়। একত্রে থাকলে কোনো ভাবাবেশের অধীনে জন-সাধারণের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি রূপ নেবে সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা দুরূহ। এইভাবে নাট্যরূপের বৈশিষ্ট্য কেবল নির্বাচনকেই সীমিত করে না, তাকে যথার্থরূপে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বাঁধার সৃষ্টি করে। যদি বিষয় নির্বাচন এবং তা উপস্থাপনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে গল্প-উপন্যাসের তুলনায় নাটকে শৈল্পিক চেতনার বিকাশ অবশ্যই বিলম্বিত।

ঈশ্বর চন্দর নন্দার প্রথম দিকের একাঙ্কগুলি মূলতঃ সমাজ-সংস্কারের চিন্তায় রচিত। এখানে রয়েছে আঞ্চলিক রসে জারিত চরিত্রসমূহ— সুদখোর, বাচাল স্ত্রীচরিত্র, ঘুষখোর কর্মচারী, ঠিকেদার, ভণ্ড সন্ন্যাসী ইত্যাদি। সুন্দর, তীক্ষ্ণ সংলাপ এবং অন্তঃসলিলা ব্যঙ্গরসের ধারায় সঞ্জীবিত এই একাঙ্কগুলি। পাঞ্জাবী একাঙ্ক বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে প্রচুর বৈচিত্র্য দেখা যায়। নন্দার সংস্কারবাদী ধারা হরচরণ সিংয়ের কাছে ভাবসমৃদ্ধে নাটকীয়তা পেল। হরচরণ সিংয়ের শক্তি নিহিত ছিলো নাটকীয় সংঘাত সে তীব্র থেকে তীব্রতর করার চেষ্টায়। সন্ত সিং সেখোঁর গভীর চিন্তাশীলতার ফলে সামান্য এবং অসামান্য দৃষ্টি দিয়ে গৌণ বিষয়ের উপরেও এক ধরণের নাটকীয় সম্পূর্ণতা এবং

গাম্ভীর্য আরোপ করতে পারেন। বলবন্ত গার্গী মানুষের সামাজিক অবস্থাকে ও নাটকের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেননি অথবা নিরপেক্ষ ভাবগম্ভীর জিজ্ঞাসা দ্বারাও প্রভাবিত হননি। তাঁর বৈশিষ্ট্য মনুষ্য-বিশেষের মানবীয় স্থিতির রহস্যময় অভিব্যক্তির মধ্যে নিহিত ছিলো। বলবন্ত গার্গীর কাছে ব্যক্তির আত্মদ্বন্দ্ব ও সংঘাত এবং তারই মাধ্যমে আত্মস্বীকৃতির প্রতীক। তিনি নিজের নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন পারস্পরিক দ্বন্দ্বে মূল তত্ত্বকে এবং ব্যক্তিদ্বন্দ্বের বিভিন্ন রূপকে। প্রতীকাশ্রয়ী ভাষা প্রয়োগ দ্বারা মানসিক অবস্থার সঙ্গে বাহ্যিক প্রকৃতির বস্তুর সঙ্গে ছায়ার মতো এক সম্পর্ক স্থাপনে বলবন্ত গার্গী অদ্বিতীয়।

যদিও কর্তার সিং দুগ্‌গল এবং গুরদয়াল সিং খোসলার নাটকের বিকাশ স্বাধীনতার পরই লক্ষিত হয়, তবুও এ কথা সত্য যে তাঁরা লাহোরেরই ফসল। কর্তার সিং দুগ্‌গল লাহোর রেডিও স্টেশনের এবং গুরদয়াল খোসলা লিটল থিয়েটার গ্রুপ, লাহোরের সৌজন্যে নাট্যকলায় পরিপক্কতা অর্জন করেন। দুগ্‌গলের নাটক প্রধানতঃ বেতার নাটকের আঙ্গিকেই রচিত, অবশ্য মঞ্চসফল কয়েকটি নাটকও তিনি রচনা করেছেন। সাধারণতঃ খুব তাড়াতাড়ি ঘটনা বদলানোয় এবং ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করা ভাবের সংঘাতকে নাটকে রূপায়িত করার মধ্যেই এই মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে দুগ্‌গল নাটকীয় সংলাপের জন্যে সমস্ত চলতি ভাষা ব্যবহারের রীতি ত্যাগ করে কল্পনাময় কাব্যিক ভাষার প্রয়োগ করেছেন। গুরদয়াল সিং খোসলার রীতি প্রধানতঃ পরিহাসাশ্রয়ী। এই পরিহাসের জোরেই তিনি মানুষের, বিশেষ করে সামাজিক মানুষের কথা আর কাজের ব্যবধানকে ব্যক্ত করে তাঁর অহংভাবের সমালোচনা করেন।

স্বাধীনতা উত্তর পাঞ্জাবী নাটকের ক্ষেত্রে সম্ভবত অমরীক সিং-ই নাটককে নিজের শিল্পচিন্তার মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে কুশলভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কিছু দিন পর তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত হ'তে থাকে অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং তিনি নাটকের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। অমরীক সিং-এর নাটকের গঠন খুবই সুন্দর। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন

দৃশ্য, মানবীয় স্বভাবের বহুমুখী দর্শন, মনকে আন্দোলিত করার মতো অসংখ্য ইচ্ছা এবং সংশয়কে নিজের নাটকে এমন সুন্দরভাবে বুনে নেন যে চরম বিস্ফোরণের পর্যায়ে সমস্ত বিরোধী তত্ত্ব এক সার্থক প্যাটার্নের মধ্যে এসে জড়ো হয়। গুরচরণ সিং জস্যুজা এবং হরসরণ সিং-এর বৈশিষ্ট্য গভীর মানবীয় সংবেদনশীলতা। তাঁরা সত্যকে সাদা-মাটা ভাবে বিচার করে সরল উপায়ে সমস্যার সমাধান করেন না—সাধারণ মানুষের জটিল চেতনাপ্রবাহকে উদ্‌ঘাটন করায় তাঁরা সচেষ্ট। এঁদের বিপরীত হলেন কর্পূর সিং ধুম্মন। তিনি ঈশ্বর চন্দর নন্দার চরিত্র-চিত্রন কৌশল এবং হরচরণ সিং-এর অতিনাটকীয়তাকে গ্রহণ করে নাটকের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের চিন্তারই প্রশ্রয় দেন।

সংকলনের সবকটি নাটকই এই নাট্যকারদের মূল শিল্পচেতনার প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। প্রত্যেকটি একাঙ্কই পাঞ্জাবী একাঙ্ক নাট্য-কলা বিকাশের এক-একটি বিশেষ ক্ষণের পরিচয় বহন করে এবং পাঞ্জাবী জন-জীবনকে এমন এক নতুন সম্ভাবনার মুখোমুখি এনে দেয় যা স্থানীয় হলেও ব্যাপকতার বিস্তৃতি। এই একাঙ্ক নাট্যকারদের মধ্যে ঈশ্বর চন্দর নন্দা, সন্ত সিং সেখোঁ, গুরদয়াল সিং খোসলা, বলবন্ত গার্গী, কর্তার সিং দুগ্‌গল এবং অমরীক সিং স্নাতোকত্তর স্তর পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন, এবং এঁদের মধ্যে কয়েকজন ইংরাজীর অধ্যাপনাও করেন। সম্ভবত এই জন্যেই পাঞ্জাবী সাহিত্যে একাঙ্কের মূল পাশ্চাত্য রূপ স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

—অতর সিং

সূচীপত্র

বেইমান

—ঈশ্বর চন্দর নন্দা

চরিত্রলিপি

মোটর ওয়ার্কশপের ম্যানেজার : বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর
মালিক (মোটরওয়ালা) : বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি
মোটরওয়ালার স্ত্রী : বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর
মিস্তিরী বসন্তরাম : বয়স ত্রিশ-বত্রিশ
একজন : পুলিশ ইনস্পেক্টর
একজন : বীমা কোম্পানীর ম্যানেজার
একজন : অন্য মিস্তিরী
চাপরাসী

স্থান : মোটর ওয়ার্কশপের ম্যানেজারের অফিস।
কাল : বিকেল চারটে-পাঁচটা।

মোটর সারানোর চাপা ঠক্‌ঠক্ শব্দ এবং কারখানার চাপা কোলাহল শোনা যাচ্ছে। মঞ্চের ডান দিকের কোণে দরজায় 'স্টোর' লেখা একটি সাইনবোর্ড ঝুলছে। অফিসে টেবিলের সামনে দেওয়ালে একটি ক্যালেণ্ডার। অফিসের বাঁ দিকে একটি টুলের উপর বসে আছে চাপরাসী। মোটরওয়ালা ডান দিক থেকে অর্থাৎ বাইরে থেকে প্রবেশ করে।

মোটরওয়ালা : (দেখে মনে হচ্ছে খুবই বিরক্ত। ম্যানেজারকে না দেখতে পেয়ে চাপরাসীকে) ম্যানেজার সাহেব কোথায়?

চাপরাসী : সাহেব তো এখানেই ছিলেন, ডেকে আনব?

মোটরওয়ালা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি করো।

(চাপরাসীর প্রস্থান)

বেইমানী একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এদিকে লম্বা-চওড়া বিল তার ওপর আবার উপরির জরিমানা আলাদা। নয়তো... নয়তো গাড়িটাতো বাঁচবে না, মিস্তিরীগুলো একটা জিনিস সারাবে তো ছুটো নষ্ট করে বসে থাকে।

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যানেজার : আসুন, আসুন—বলুন কি করতে হবে। (চেয়ার দেখিয়ে) বসুন।

মোটরওয়ালা : পরশু আমি হেডলাইটের ডীপারটা সারানোর জন্যে পাঠিয়েছিলাম।

ম্যানেজার : সেটা কি এখনও হয় নি নাকি? মিস্তিরীকে তো

অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। (চাপরাসীকে) বসন্তরামকে ডাকো তো।

মোটরওয়ালা : না না, ডাকার দরকার নেই। ডীপার ঠিক হয়েছে।

ম্যানেজার : কোনও কিছু বাকী রয়ে গেছে ? এক্ষুণি ঠিক করে দিচ্ছি।

মোটরওয়ালা : না না খারাপটারাপ কিছু নেই। এক্কেবারে নেই। ডীপারটা তো একেবারে নতুন হয়ে গেছে।

ম্যানেজার : ধন্যবাদ ! আমার তো পলিসিই এই 'ভালো কাজ, চড়া দর'। আপনি তো জানেন আমরা খুব ভালো কাজ জানা মিস্তিরী রাখি, তার জন্যে অবশ্য মাইনেও দিতে হয় বেশি। আনাড়ী মিস্তিরী-দের ওয়ার্কশপের আশেপাশে ঘেঁষতে দিই না একদম। অন্য ওয়ার্কশপে এই কথাটি কখনো শুনবেন না।

মোটরওয়ালা : আপনাদের কাজ তো খুব ভালো এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই।

ম্যানেজার : অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের মতো ভদ্দরলোকদের খুশী করতে পারলেই আমরা খুশী। সত্যি! আপনাদের জন্য আর কি করতে পারি বলুন ?

মোটরওয়ালা : বলতে তো চাই, কিন্তু একটু ইয়ে মানে ভয়ভয় লাগছে।

ম্যানেজার : আরে ভয়ের কি আছে ? এতো আপনার নিজের গ্যারেজ—আপনি শুধু মুখ ফুটে বলুন।

মোটরওয়ালা : জিজ্ঞেস করছিলাম আপনার এখানের মিস্তিরী-দের 'টিপ্‌স' দেওয়ার রেওয়াজটা কবে থেকে চলছে ?

ম্যানেজার : আমার এখানে তো ওসব রেওয়াজ নেই। কখনো ছিলও না, হবেও না কখনো। 'টিপ্‌স' দেওয়ার কি দরকার ? মিস্তিরী-দের আমি যথেষ্ট ভালো মাইনে দিই, তাছাড়া আলাদা ওভার-টাইম আছে। এর ওপরেও 'টিপ্‌স' চাওয়ার ভিখিরীপনা কেন ? আপনার কাছে কেউ চেয়েছিলো নাকি ?

মোটরওয়ালা : সত্যি কথা বলতে কি আমি তো বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

ম্যানেজার : নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছে।

মোটরওয়ালা : আমার কাছে তো দুটো মাত্র পথ খোলা। এক তো মিস্তিরীদের পকেট গরম করতে হবে, নয় তো ভগবানই জানেন কত আজেবাজে খরচা করাবে। আর যদি কেউ খেপে যায় তা হলে হয় তো আমার জীবনই বিপন্ন হবে।

ম্যানেজার : এটা কি বলছেন দাদা, এতো সাহস কার হবে ?

মোটরওয়ালা : আর নয় তো দ্বিতীয় পথ রয়েছে—এই গ্যারেজ ছেড়ে দেওয়া।

ম্যানেজার : (সহাস্যে) আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছেই বা কে ? বাহ্, দাদা বেশ। এই গ্যারেজ আপনার সুবিধের জন্যে, না মিস্তিরীদের জন্যে। আপনার মতো ভদ্দরলোক এখান থেকে রেগেমেগে চলে যাওয়ার থেকে বড় বদনাম তো আমাদের কিছু হতে পারে না।

মোটরওয়ালা : কিন্তু ম্যানেজার সাহেব, ব্যাপারটা তো প্রায় তেননিই দাঁড়াচ্ছে।

ম্যানেজার : হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন তা ঠিকই, কিন্তু আমার কথাটাও একটু শুনুন। কোনো মিস্তিরী যদি কোনো ছুতোয় বেশি পয়সাটয়সা চেয়ে থাকে তার জন্য আমি সত্যই দুঃখিত। আপনি দয়া করে ঐ বদমাসটার নাম বলুন, আমি সব ব্যবস্থা করছি। এমন শাস্তি দেব যে চিরজীবন মনে রাখবে।

মোটরওয়ালা : সে আপনি শাস্তি দিন আর নাই দিন তা আপনার ব্যাপার। আমার কথাটা আপনি বুঝেছেন তো ?

ম্যানেজার : হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো করে বুঝেছি। সত্যি কথা বলতে কি, এ ব্যাপারে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। এখন আমি শুধু ভাবছি আপনাকে কি করে একেবারে পুরোপুরি খুশী করা যায়। আপনি বলুন, আসল ঘটনাটা কি ?

মোটরওয়ালা : ধন্যবাদ। কথাটা হল— আপনি তো নিজেই দেখেছিলেন যে আমার গাড়ির হেডলাইটা ঠিক কাজ করছিল না।

ম্যানেজার : হ্যাঁ, দেখেছিলাম।

মোটরওয়ালা : আর মিস্তিরী ডীপারটা সারানোর জন্যে গাড়ি

থেকে বের করে নিয়েছিল।

ম্যানেজার : হ্যাঁ।

মোটরওয়ালা : আজ যখন আমি এলাম তখন মিস্তিরী বললো...

ম্যানেজার : কি বললো ?

মোটরওয়ালা : ডীপার নাকি এমন খারাপ হয়েছে যে তা আর সারানোই যেতো না।

ম্যানেজার : হুঁ।

মোটরওয়ালা : তাই আমি ওর জায়গায় অন্য ডীপার লাগিয়ে দিয়েছি।

ম্যানেজার : আচ্ছা, তাই নাকি।

মোটরওয়ালা : আর আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম— আমার ডীপারটা কোথায়, তখন জবাব পেলাম সেটা নাকি এতো খারাপ হয়ে গেছে যে সেটা রদ্দিতে ফেলে দিতে হয়েছে। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম—এটার দাম কত, তখন আমাকে মিস্তিরী বললো—'যা খুশী হয় দেবেন'। শুনে তো আমি তাজ্জব বনে গেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'ডীপার স্টোর থেকে নিয়েছো'—তাতে জবাব দিল, 'ধরে নিন স্টোর থেকেই দিয়েছি। কিন্তু তাতে আপনার কি এসে গেল। আপনি খুশী হলে কিছু দিতে পারেন, না হলে দেবেন না। আমি আপনার কাজ করে দিয়েছি।' এর কোন উত্তর আমার যোগাল না। সত্যি কথা বলতে কি আমি খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে মিস্তিরী বললো—'আমার কথা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন ?' আসলে কিন্তু আমি ওর কথার মানে ঠিক ধরেছিলাম। আমার চুপ করে থাকাটাই আমার নিজের কাছেই এত অস্বস্তিকর লাগছিল যে আমার মুখ থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল, 'ঠিক আছে, তোমায় পাঁচ টাকা দেব'। তা শুনে ও খুব খুশী হয়ে বললো, 'অনেক ধন্যবাদ। কিছু বকশিস-টকশিস পেলে আমি খুব যত্ন নিয়ে ভালো করে কাজ করে দিতে পারি।' ব্যস, তখন থেকেই আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি। ভাবছিলাম ওকে টাকাটা দেব,··· না তার আগে আপনার সঙ্গে কথা বলে নেবো ?

ম্যানেজার : আপনি আমার যে উপকার করলেন তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ ।

মোটরওয়ালা : আমি ঠিক বলতে পারছি না ঐ ডীপারটা নতুন, না আমার পুরানোটাই পরিষ্কার-টরিষ্কার করে লাগিয়ে দিয়ে এখন আমার কাছে পয়সা চাইছে।

ম্যানেজার : আশ্চর্য বেইমানী তো ! (চাপরাসীকে) হরবংশকে ডেকে আনো। (চাপরাসীর প্রস্থান) কি বলে যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব বুঝতে পারছি না। লজ্জায় মাথা আমার মাটিতে মিশে গেছে। পাঁচ-ছ বছর ধরে আমি এই ওয়ার্কশপের ইনচার্জ, কিন্তু এই প্রথম আমি এমন লজ্জায় পড়লাম। আমি এতদিন বিশ্বাস করতাম আমার এখানের মিস্তিরীরা কেবল ভালো কারিগরই নয়, ভদ্দরলোকও। কিন্তু এই বেইমানটা আমাকে একেবারে পথে বসলো।

(হরবংশের প্রবেশ)

হরবংশ : আমাকে ডাকছিলেন ?

ম্যানেজার : হ্যাঁ। হরবংশ, দেখো তো, সাহেবের গাড়িতে বসন্তরাম যে ডীপার ফিট করেছিল, সেটা খুলে নিয়ে এসো। খুব সাবধানে করো যেন বসন্তরাম এসব জানতে না পারে। তাড়াতাড়ি করো।

হরবংশ : এক্ষুণি আনছি।

ম্যানেজার : ঐ পয়সাটয়সা দেবার ব্যাপারে যা বললেন এটা তো তার চেয়েও বেশি লজ্জার। এক্ষুণি বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল।

মোটরওয়ালা : ম্যানেজারবাবু, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন আমার একি এক ঝামেলা। একবার ঘুষ দিয়ে চিরকালের মতো ঝামেলা পাকিয়ে রাখা, আর এই মিস্তিরী তো নিত্য নতুন ঝামেলা পাকাতে পারে। আমার বাঁচার এখন একটাই রাস্তা— অন্য কোনো ওয়ার্কশপের শরণাপন্ন হতে হবে।

ম্যানেজার : আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আমি সব ব্যবস্থা করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ প্রশ্ন তো আপনার একার নয়, আমারও বটে। আপনার এই ব্যাপারটা সোজাসুজি আমাকে

জানানোর জন্যে আমি আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো ভেবে পাচ্ছি না। কে জানে আমাদের কতজন ভদ্দরলোক খদ্দের আমাদের ছেড়ে গেছেন— সাপের মুখে ছুঁচোর অবস্থা হয়েছে তাদের। এ ব্যাপারটার একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখে তবে ছাড়ব।

(হরবংশের ডীপার নিয়ে প্রবেশ)

হরবংশ : (ডীপার দিতে দিতে) এই নিন ডীপার। আমি কি দাঁড়াবো?

ম্যানেজার : না, দাঁড়ানোর দরকার নেই—যাও।

(হরবংশের প্রস্থান। ম্যানেজার খুব লক্ষ্য করে ডীপার পরীক্ষা করতে থাকেন)

ডীপার তো নতুন নয়, কিন্তু দেখতে একেবারে নতুনই লাগছে। খুব খাটাখাটনি করে পরিষ্কার করেছে।

মোটরওয়ালা : তার মানে? এটা ঐ পুরোনো ডীপারটা নাকি?

ম্যানেজার : এটা যে নতুন নয় এটা একেবারে সত্যি, কারণ নতুন জিনিস এতো বেশি চক্‌চক্ করে না। (দেখায়) এই দেখুন। দেখছেন কেমন চক্‌চক্ করছে। স্রেফ পেট্রোলের কেরামতি। তবু একবার খুলে দেখা যাক।

(টেবিলের ড্রয়ার থেকে স্ক্রুড্রাইভার বের করে)

মোটরওয়ালা : লোকটা তো তা হলে আমার সঙ্গে বেশ চালাকি করেছে।

ম্যানেজার : এ কাজের ফল ভুগলে তবে মজাটি বেরোবে বাছাধনের। চালাকি বের করে দিচ্ছি। (চাপরাসীকে) বসন্তরামকে ডাকো তো।

চাপরাসী : এক্ষুণি ডাকছি হুজুর।

মোটরওয়ালা : যদি ওর সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চান তা হলে আমি দূরে অপেক্ষা করতে পারি।

ম্যানেজার : না না, আপনি যাবেন কেন? সব কথা আপনার সামনেই জিজ্ঞেস করব।

মোটরওয়ালা : কি ব্যাপার ম্যানেজার সাহেব, আগেও এমনি

ঘটনা ঘটেছে নাকি ?

ম্যানেজার : কে জানে ঘটেও থাকতে পারে, আমার নোটিশে অবশ্য আসে নি। আমি তো ওয়ার্কশপের নিয়মের মধ্যে বিশ্বাস আর কারিগরী এ দুটো ব্যাপারের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিই। কিন্তু এই বেইমানটা আমার সব চেষ্টাকে জলাঞ্জলি দেওয়ালো।

(বসন্তরামের প্রবেশ)

ম্যানেজার : (রাগতস্বরে) তোমার নামে নালিশ আছে— কমপ্লেন।

বসন্তরাম : হ্যাঁ।

ম্যানেজার : হ্যাঁ মানে ? হ্যাঁ মানেটা কি ? তুমি কি করে জানলে ?

বসন্তরাম : আজ্ঞে হরবংশকে গাড়ি থেকে ডীপার বের করতে দেখলাম। (মোটরমালিককে দেখিয়ে) তা ছাড়া উনিও এখানে রয়েছেন।

ম্যানেজার : তোমার কিছু বক্তব্য আছে ?

বসন্তরাম : আজ্ঞে না, কিছু না।

ম্যানেজার : কিছু না ? কিছু না মানেটা কি ?

বসন্তরাম : আজ্ঞে আমি তো বুঝতেই পারছি না আমার দোষটা কি ? তাই কি আর কি বলতে পারি বলুন ?

ম্যানেজার : তুমি জানো না যে তোমার বিরুদ্ধে কিসের নালিশ ? খুব সাধু সাজছ না ?

বসন্তরাম : আজ্ঞে আমার ভাগ্য খারাপ তাই নালিশ হয়েছে, কিন্তু আমার দোষটা কি তা ঠিক জানি না।

ম্যানেজার : ঠিক আছে, না জানো তো না জানলে। এখন আমার কথার জবাব দাও। এঁর গাড়িতে ডীপার তুমি ফিট করেছিলে ?

বসন্তরাম : আজ্ঞে হ্যাঁ।

ম্যানেজার : ডীপার এঁরই ছিলো ?

বসন্তরাম : আজ্ঞে হ্যাঁ, এঁর গাড়ি থেকে খুলেছিলাম, সুতরাং এঁরই হবে।

ম্যানেজার : দেখো বসন্তরাম, এ ধরনের বাঁকাত্যাড়া কথা এখন

তুলে রাখো। যা জিজ্ঞেস করি সোজাসুজি জবাব দাও।

বসন্তরাম : ভাগ্য খারাপ হলে সবসময় এরকমই অবস্থা হয়—।

ম্যানেজার : ভাগ্য নিয়ে কাঁদাকাটা করার অনেক সময় পাবে। এখন সোজাসুজি বলো এই ডীপারটা এঁর কিনা? নাকি নতুন?

বসন্তরাম : এঁর। নতুন কোত্থেকে আসবে?

ম্যানেজার : তবে তুমি এঁকে বলেছিলে কেন ডীপারটা নতুন?

বসন্তরাম : আজ্ঞে, আমি কখন বললাম? আমি তো শুধু বললাম ডীপারটা ওঁর গাড়ি থেকে নিয়েছি, ওটা ওরই।

ম্যানেজার : সে তো তুমি এখন বলছ। আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি এঁকে ডীপারের ব্যাপারে কি বলেছিলে?

বসন্তরাম : আজ্ঞে বলেছিলাম—ডীপারটা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সারিয়ে-টারিয়ে একেবারে নতুন করে দিয়েছি। কি, আপনিই বলুন তাই বলেছি কিনা।

মোটরওয়ালা : মিথ্যে কথা, ডাহা মিথ্যে কথা। তুমি বল নি ডীপার একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, রদ্দিতে ফেলে দিয়েছ আর তার জায়গায় নতুন ডীপার ফিট করেছ?

বসন্তরাম : আজ্ঞে আপনি বড়লোক, কোনো উল্টোপাল্টা কথা তো আর বলতে পারি না। তবে আসল কথাটা হল গিয়ে আপনি বোধহয় বুঝতে একটু ভুল করেছেন।

মোটরওয়ালা : (রেগে গিয়ে) তার মানে আমি যা কিছু শুনেছি ভুল শুনেছি, যা বুঝেছি, ভুল বুঝেছি। মানে আমার বুদ্ধি-বিবেচনা নেই, অর্থাৎ আমার মাথা খারাপ হয়েছে।

বসন্তরাম : না, দাদা, আপনি রাগ করবেন না। ...আপনি যে ভুল বুঝেছেন এটা কিন্তু ঠিক।

মোটরওয়ালা : (ব্যঙ্গ করে) তুমি বোধহয় এটাও বলবে যে উপরি পয়সা যেটা চেয়েছিলে, সেটাও আমার—

বসন্তরাম : (বাধা দিয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটাও আপনি নির্ঘাত ভুল বুঝেছেন। আমি কোনো উপরি পয়সা-টয়সা চাই নি। এমন কি আপনি নিজেই বলেছিলেন, নতুন ডীপার লাগিয়ে দিলে ভালো হতো।

আমিই যখন আপনাকে বোঝালাম যে নতুন ডীপার ন'-দশ টাকা পড়ে যাবে তখন তো আপনিই বললেন যে, 'না ভাই দু-তিন টাকায় যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে খুব ভাল হয়' (ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে) আজ্ঞে আমি এও বলেছিলাম ওয়ার্কশপে যদি এটা না করা যায় তাহলে আপনি অনায়াসে এসে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে দিতে পারেন।

মোটরওয়ালা : আশ্চর্য, আশ্চর্য। আমি কি শুনছি—আমি জেগে আছি না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি?

বসন্তরাম : আমার তো মনে হয়, আজ্ঞে, আপনিই স্বপ্নই দেখছিলেন।

ম্যানেজার : চুপ কর, অসভ্য, বেহায়া। (মোটরওয়ালাকে) আপনি চিন্তা করবেন না স্যার, আমি এই বেইমানটাকে সোজা করছি।

মোটরওয়ালা : তা তো বুঝলাম। কিন্তু এ তো উল্টে আমার ঘাড়েই যত রাজ্যের দোষ পড়ছে। চোর উল্টে পুলিশকেই ধমকায়—আজব ঝামেলা। তাও এখনো বাল্বের ঘটনাটা তো বলিই নি ম্যানেজার সাহেব। আপনারা আমাকে কি ভাবছেন কে জানে।

ম্যানেজার : আজ্ঞে আপনি একেবারে খাঁটি ভদ্দরলোক, আর এই বেইমানটা আপনার এতো ক্ষতি করলো, আপনাকে অপমান করলো। আমি সত্যি খুব লজ্জিত। ঐ বাল্বের কি ঘটনা বলবেন বলছিলেন।

মোটরওয়ালা : হ্যাঁ বলবো তো বটেই কিন্তু আবার কি দোষ আমার কাঁধেই ভর করে কে জানে। এই ধরনের বাজে লোকের সঙ্গে আমাকে কোনোদিন কাজ করতে হয় নি—কথায় কথায় আমাকেই মিথ্যেবাদী বানিয়ে ছেড়ে দিল।

ম্যানেজার : আপনি বলুন স্যার, এর জন্য এতটুকু চিন্তা করবেন না।

মোটরওয়ালা : কথাটা হল গিয়ে, আপনার এই মিস্তিরী বলছিল যে আমার গাড়ির বাল্ব নাকি একেবারে পুরোনো হয়ে গেছে—নতুন কিনতে হবে, নয়তো ডীপারে কোনো কাজ হবে না।

ম্যানেজার : হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।

মোটরওয়ালা : হ্যাঁ আবার বলে কি 'আপনাকে সস্তায় যোগাড় করে দেব।'

ম্যানেজার : হুঁ, কোত্থেকে ?

মোটরওয়ালা : নিজের বাপের জমিদারী থেকে। উঃ, কি ঝামেলা যে ফেঁদে বসেছে—

ম্যানেজার : হ্যাঁ বসন্তরাম, বলো ব্যাপারটা কি ?

বসন্তরাম : ব্যাপারটা হলো আমার মাথা আর মুণ্ড। সব একেবারে মনগড়া ব্যাপার, আমাকে দোষী করার জন্যে সব বানানো।

মোটরওয়ালা : শুনলেন, কথাটা শুনলেন ? আমার বেইজ্জতি করার যেটুকু বাকী ছিল, সেটাও ষোল কলা পূর্ণ হলো। আমাকে মিথ্যেবাদী, বেইমান, জুলুমবাদ সবকিছু একেবারে একসঙ্গে বানিয়ে ছেড়ে দিল।

বসন্তরাম : (নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টায়) আপনি তো দাদা মিছা-মিছি চটে যাচ্ছেন। এর একটা কথাও আমি আপনার সম্বন্ধে বলি নি।

মোটরওয়ালা : ওঃ, অনেক হয়েছে, অনেক হয়েছে। আর নয়। আমি আমার হার স্বীকার করে নিচ্ছি, তুমিই ঠিক। ব্যস্।

ম্যানেজার : তুমি চুপ করো অসভ্য। মুখ সামলে কথা বলো।

বসন্তরাম : ঠিক আছে স্যার, কথাই বলব না, চুপ করেই থাকছি।

ম্যানেজার : না, উনি তোমার সম্বন্ধে যে নালিশ করেছেন তা মানছো, স্বীকার করো ?

বসন্তরাম : তা আজ্ঞে, আমি কি করে মানতে পারি ?

ম্যানেজার : তার মানে তুমি নির্দোষ।

বসন্তরাম : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ম্যানেজার : দেখো সব কথা ঠিক ঠিক পরিষ্কার বলো।

বসন্তরাম : তার মানে মিথ্যেগুলো সব মেনে নিয়ে ক্ষমা চাইতে বলছেন—এই তো।

মোটরওয়ালা : শুনুন, কথাগুলো শুধু শুনুন।

ম্যানেজার : বসন্তরাম, পরে কিন্তু বোলো না যে তোমাকে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগই দেওয়া হয় নি। (মোটরওয়ালাকে)

আপনি দয়া করে আপনার অভিযোগগুলো লিখে দিন যাতে সেগুলো এর ফাইলে যায়। তার উপরই আমি আমার অর্ডার দিয়ে দেব। (বসন্তরামকে) তুমি কোনো লিখিত বক্তব্য পেশ করতে চাও?

বসন্তরাম : না আজ্ঞে।

ম্যানেজার : আর কিছু বলার আছে?

বসন্তরাম : না।

ম্যানেজার : যাও, নিজের কাজ করগে যাও।

বসন্তরাম : নমস্কার। (মোটরমালিককেও) নমস্কার।

(বসন্তরামের প্রস্থান। মোটরমালিক পকেট থেকে কলম বার করে কাগজে অভিযোগ লিখতে থাকে। নেপথ্য থেকে শোনা যায়···)

প্রথম স্বর : বসন্তরাম।

দ্বিতীয় স্বর : বসন্তরাম।

তৃতীয় স্বর : কি ব্যাপার গুরু, এত হল্লা-হাঙ্গামা কিসের?

বসন্তরাম : না, ও কিছু না।

চতুর্থ স্বর : কি না? ম্যানেজার সাহেব খুব গর্জন করছিল?

পঞ্চম স্বর : আরে ভায়া ঘাবড়ো না, যত গর্জায় তত বর্ষায় না।

প্রথম স্বর : বসন্তরাম, আসল ব্যাপারটা কি?

বসন্তরাম : আরে ও কিছু না, নিজের কাজ করগে যাও।

মোটরওয়ালা : (অভিযোগপত্র দিয়ে) এই নিন, যা করবার করুন। আমি তো ঠিক করে নিয়েছি যে···

ম্যানেজার : (বাধা দিয়ে) আমি বুঝতে পারছি আপনি কি ভাবছেন। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি—তাড়াহুড়ো করবেন না। আমরা আপনাকে পুরোপুরি খুশী করে দেব দেখবেন। আপনাকে আমরা কোনোমতেই চটাতে পারি না।

(মোটরমালিকের স্ত্রীর প্রবেশ। হাতে দু-তিনটে প্যাকেট।)

স্ত্রী : কি হলো, তুমি তো অনেক দেরী করিয়ে দিলে। শপিং হয়ে গেল, গাড়ি এখনও ঠিক হল না?

মোটরওয়ালা : আচ্ছা ম্যানেজার সাহেব, চলি তাহলে অনেক দেরী হয়ে গেল।

ম্যানেজার : হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি অনেক দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু আর দুমিনিট বসুন দয়া করে। দিদি আপনিও বসুন না একটু, (মিনতি করে) স্রেফ দুমিনিট।

মোটরওয়ালা : উঃ, অনেক ঝামেলা গেল, আজ চলি—

স্ত্রী : কি ব্যাপার গাড়ি এখনও ঠিক হয় নি ?

ম্যানেজার : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হয়ে গেছে—একেবারে ঠিক। (মোটর-মালিককে) বসন্তরামের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তটা শুনেই যান।

মোটরওয়ালা : মাফ করুন দাদা, খুব তাড়া আছে।

ম্যানেজার : আরে এক্ষুণি হয়ে যাচ্ছে। (চাপরাসীকে) শোনো, বসন্তরামকে ডাকো তো। দাদা, এক মিনিটে সব সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিচ্ছি। (বসন্তরামের প্রবেশ) বসন্তরাম, তুমি খুব অন্যায় করেছ। আমাদের এরকম সম্মানীয় ভদ্দরলোককে তুমি ঠকিয়েছ। তুমি চাপ দিয়ে এঁর কাছে পয়সা আদায় করেছ—নিজে তো বেইমান বনেইছ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখেও চুন-কালি লাগালে। শোনো, তোমাকে এখন থেকে ডিস্‌মিস্ করা হল।

বসন্তরাম : (আশ্চর্য হয়ে) ডিস্‌মিস্ ডিস্‌মিস্ !

ম্যানেজার : হ্যাঁ ডিস্‌মিস্। তোমার মতো মিস্তিরী রাখা মানে আমাদের খদ্দেরদের অপমান করা, বুঝেছ ?

বসন্তরাম : কিন্তু আজ্ঞে, উনি আমার ঘাড়ে যে সব দোষ চাপাচ্ছেন, আমি তা মানতে রাজী নই।

ম্যানেজার : ঠিক আছে, কিন্তু তুমি মানতে রাজী নওই বা কেন ?

বসন্তরাম : না মানছি না, মানছি না। এখন লুকোনোর চেষ্টা করার কোনো মানে হয় না।

ম্যানেজার : (আশ্চর্যান্বিত) তুমি নিজের দোষ স্বীকার করছ ? সত্যি সত্যি ঠকিয়েছ, মিথ্যা কথা বলেছ ?

বসন্তরাম : আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ঠকিয়েছি, মিথ্যা বলেছি।

ম্যানেজার : সত্যি কথা বলো, প্রথমে কি তুমি মিথ্যে বলেছিলে ?

বসন্তরাম : আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যি বলছি। প্রথমে মিথ্যে কথা বলেছি। (মোটরমালিককে দেখিয়ে) উনি আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন তার প্রত্যেকটা কথাই সত্যি আর আমি যা বলেছি তা একেবারে ডাহা মিথ্যে।

সকলে : কি ?

ম্যানেজার : কি বলছ কি? আমাদের বোকা বানানোর চেষ্টা করছ ?

বসন্তরাম : আজ্ঞে না, আমি তো স্বীকার করছি আগে যা বলেছি সব মিথ্যে।

মোটরওয়ালা : মিথ্যে কতক্ষণ আর চাপা থাকবে ?

ম্যানেজার : চোপ, বদমাস। বল, আগে যা বলেছিলে সব সত্যি ছিল, মিথ্যে নয়।

বসন্তরাম : আজ্ঞে ডিস্‌মিস্‌ তো করেই দিয়েছেন। এখন আর কিসের ভয়ে সত্যিকে মিথ্যে আর মিথ্যেকে সত্যি বলব ?

মোটরওয়ালা : ম্যানেজার সাহেব, আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। কেন ওকে দিয়ে মিথ্যেটা সত্যি বলাতে চাইছেন ? তার মানে কি আমাকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করতে চাইছেন ?

ম্যানেজার : না না, এ হতেই পারে না। আসলে এযে এত বড় মিথ্যেবাদী আমি ভাবতে পারি নি। ভেবেছিলাম হয়ত কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আর আমাদের দিক থেকে দেখতে গেলে আপনারা দুজনেই সত্যি বলেছেন ধরতে হবে।

মোটরওয়ালা : এ ভালো নাটক শুরু করেছেন—আমাকে একে-বারে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিলেন মশাই।

ম্যানেজার : কিছু মনে করবেন না স্যার—আপনার এ কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। আমি আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করি। আমার কারখানা তো আপনাদের দয়াতেই চলছে। কিন্তু বিজনেস বড় ঝামেলার জিনিস।

স্ত্রী : আপনি খুব চালাক ম্যানেজার সাহেব।

মোটরওয়ালা : আপনাদের ব্যবহারে সত্যি খুব লজ্জা আর দুঃখ

পেলাম।

ম্যানেজার : (সহাস্যে) আপনি অত ভাবছেন কেন—আমি আপনার চাকর হুজুর।

মোটরওয়ালা : রিপোর্ট-টিপোর্ট একেবারে অকারণে করলাম। চুপচাপ গাড়ি অন্য ওয়ার্কশপে নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল।

ম্যানেজার : এ কথা বলবেন না দাদা। একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি জল কতদূর গড়ায়।

মোটরওয়ালা : এই তুচ্ছ মিস্তিরীর সামনে আমার সব মান-সম্মান বুদবুদের মতো নিমেষে শেষ করে দিলেন।

ম্যানেজার : না স্যার, এখনও আপনি শেষ দেখেন নি। বাঁকাও থাকবে না, বাঁশীও বাজবে না।

বসন্তরাম : তার মানে আমাকে এইভাবে শেষ করে দেওয়া হবে?

ম্যানেজার : তোমাকে তোমার প্রাপ্য শাস্তিই দেওয়া হবে। তোমাকে ডিস্‌মিস্ করা হবে।

বসন্তরাম : একটা সত্যি কথা বলব—সব রকমের ডিস্‌মিস্‌ই হলো জুলুমবাদী।

মোটরওয়ালা : আরে চিন্তা কোরো না, দু-চার দিন পর, আবার এখানে বহাল হয়ে যাবে।

ম্যানেজার : না স্যার, এ একেবারে পাকা আদেশ।

মোটরওয়ালা : (বিড়বিড় করে) এ আবার আরেক চাল।

ম্যানেজার : (সহাস্যে) আমায় মিথ্যুক বলুন আর যাই বলুন আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। আগে এর মিথ্যেবাদী আর বেইমানী অভ্যেসগুলো সম্বন্ধে ভালো করে জানতাম না। এখন ও সব মেনে নিয়েছে সুতরাং আমার মতামতও একেবারে পাকা। এখন আর কোন ভয় নেই। আমার কারখানায় এ রকম বেইমান মিস্তিরীর জায়গা নেই।

মোটরওয়ালা : আচ্ছা, নমস্কার। আসি এবার, (স্ত্রীকে) চলো।

ম্যানেজার : একটু দাঁড়ান, (চাপরাসীকে) তুমি চট্ করে গিয়ে দুটো 'ভিমটো' নিয়ে এসো তো।

বসন্তরাম : কি দাদা, এখন মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তো?

মোটরওয়ালা : ম্যানেজার সাহেব, এ ধরনের কথা শোনার জন্য আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।

বসন্তরাম : (চটে গিয়ে) আপনাকে দাঁড়াতেই হবে—এখনও আমার অনেক কিছু বলার আছে।

ম্যানেজার : চুপ, একদম চুপ করো।

বসন্তরাম : চুপ করব। ডিস্‌মিস্ করে এখন চুপ করার হুকুম করছেন। আপনি আমার চাকরী খেলেন, ভবিষ্যৎ নষ্ট করলেন, এরপরেও বলছেন চুপ করে থাকতে। সারা শরীর এখন রাগে রি-রি করে চিৎকার করে উঠতে চাইছে।

ম্যানেজার : তুমি নিজের কাজের জন্যে শাস্তি পেয়েছো?

বসন্তরাম : সত্যি কথা বলার জন্যে শাস্তি—

ম্যানেজার : না মিথ্যে কথা বলার, ঠকানোর, বেইমানীর জন্যে।

বসন্তরাম ; ব্যস এই কাজের জন্যেই আমায় ডিস্‌মিস্ করে দিলেন। ছোট্ট একটু ভুলের জন্যে এত বড় শাস্তি।

ম্যানেজার : ছোট্ট ভুল! তার মানে? তোমার কাছে কি মিথ্যে কথা বলা, ঠকানো, বেইমানী করা ছোটখাটো দোষ?

বসন্তরাম : না তা অবশ্য নয়, কিন্তু এই বড়-বড় কারখানা, এই বিরাট বিরাট বাড়ি, এতো সব সম্পত্তি তৈরি করতে কেউ কি একটুকুও মিথ্যে বলে নি? সব সত্য আর ন্যায়ের পথে তৈরি হয়েছে? মিথ্যে আর বেইমানী দিয়ে পয়সা কামাও, ঘুষ খাও, ব্লাক মার্কেট করে ট্যাক্স ফাঁকি দাও আর নিজের শক্তি দেখাতে থাকো। তারপর আর কার ক্ষমতা আছে যে মিথ্যে সম্বন্ধে একটা কথাও উচ্চারণ করবে। বড়-লোকের, শক্তিশালীর মিথ্যে, মিথ্যে নয়। মিথ্যের ভাগীদার কেবল গরীবরা, কাঙালীরা—ব্যস।

ম্যানেজার : ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাও এখান থেকে। তোমার লেকচার শুনতে চাই না। তোমার বাড়াবাড়ি দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

বসন্তরাম : আমি গরীব লোক, অত জোর কোথায় যে বাড়াবাড়ি করব?

ম্যানেজার : ঠিক আছে, মুখ বন্ধ করে এখান থেকে বেরিয়ে

যাও।

বসন্তরাম : হ্যাঁ বেরিয়ে তো নিশ্চয়ই যাবো, কিন্তু তার আগে আমার কিছু অপ্রিয় কথা আপনাদের শুনতে হবে।

মোটরওয়ালা : আশ্চর্য, লোকটা মিস্ত্রী, না কি···

বসন্তরাম : (বাধা দিয়া) আজ্ঞে বলুন বেজন্মা, কিন্তু তাতে আপনার কি এসে গেল। আপনারা বড়লোক, বাঙলোতে থাকেন, ভালো খাওয়া-দাওয়া করেন, নরম বিছানায় শোন—জন্ম আপনাদের জন্যে সুখের, আরামের। ক্ষিদে, তেষ্টা, অভাব কি জিনিস আপনারা কি বুঝবেন!

ম্যানেজার ও মোটরওয়ালা : (একসঙ্গে) আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে, এবার চুপ করবে কিনা?

বসন্তরাম : আমি নিজের জীবন নিয়ে জ্বলতে জ্বলতে, ভাগ্য নিয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে আপনাদের আশীর্বাদ করে বাড়ি যাবো। বাড়িতে বাচ্চারা পয়সা চাইলে মার খাবে, বৌ তাদের ছাড়াতে এলেও মার খাবে। আমি প্রত্যেকটা মানুষ, ভাগ্য, ভগবান সবাইকে চাবকাবো আর তারপর নিজের ছোট্ট বাচ্চাদের পেট ভরাতে আবার কোনো ভদ্দরলোকের পকেট কাটবো।

ম্যানেজার : জাহান্নামে যাও, যা ইচ্ছে করো। এখানে কান্নাকাটি বন্ধ করো—অনেক শুনেছি তোমার বক্তৃতা।

বসন্তরাম : এখনও অনেক বাকী। সে সবও শুনতে হবে।

মোটরওয়ালা : (স্ত্রীকে) ওঠ, চলো, চলো।

স্ত্রী : না, আমি সব শুনে যাবো। হ্যাঁ, মিস্তিরী—বলো, বলো, যা বলছিলে।

মোটরওয়ালা : আহ্ ব্যস, ব্যস—অনেক শুনে নিয়েছি।

ম্যানেজার : চুপ করো, চলে যাও, নয় তো...

বসন্তরাম : নয় তো কি ফাঁসী দেবেন—দিয়ে দিন।

স্ত্রী : না না মিস্তিরী, বলো, বলো···।

বসন্তরাম : আপনি মায়ের মতন। আমায় মাফ করবেন—আমার দোষ বেইমানী নয়, দারিদ্র্য। অন্ধকার ঘরে থাকি। সারাদিন খাটা-

খাটনির পর শুকনো রুটি খাই। দুধ-ঘিয়ের তো গন্ধই পাই নি কোন-দিন। এই দেখুন (কামিজ দেখায়) আমার কামিজের অবস্থা। গেঞ্জী টাও কি বিশ্রী নোঙরা। বৌ-বাচ্চার জামা-কাপড়েরও একই অবস্থা—ছেঁড়া ফাটা। কিন্তু ভগবান স্বাক্ষী, এ সব জিনিসের জন্য কখনো বেইমানী করি নি। কিন্তু অসুখ আর ক্ষিধে যে চাপতে পারি নি। বৌ অসুখ হয়ে বিছানায় পড়ে, বাচ্চাগুলো ক্ষিধের জ্বালায় চেঁচাচ্ছে। ঔষধের, দুধের জন্য পয়সা নেই, আর এক বন্ধু মিস্তিরীর কাছে ধার চাইলাম—কিন্তু ওর অবস্থাও আমারই মতন। শেষ অবধি ভাবলাম আপনারা বড়লোক, দু-চার পয়সা আপনাদের কি এসে যায়। আপনা-দের থেকেই পয়সা বাঁচিয়ে যদি ওষুধপথ্য নিয়ে যাই তাতে দোষটা কোথায়? মরতে বসে লজ্জা করে কি লাভ? বাধ্য হয়ে মিথ্যে বলেছি, বেইমানী করেছি। এই আমার দোষ।

স্ত্রী : (ম্যানেজারকে) আপনি এর মাইনে কেন বাড়ান না, কি করবে বেচারা—ক্ষিধেয় মরছে।

মোটরওয়ালা : ছাড়ো তো এসব, এই বেইমানটার জন্য ওকালতী করছ।

ম্যানেজার : এই বেইমানটাই তো আমার বদনাম করে দিল।

বসন্তরাম : আজ্ঞে, আমার বেইমানী আপনার নজরে পরে তাড়া-তাড়ি, কিন্তু নিজের দিক একবার তাকিয়ে দেখেছেন? আমি তো আর অন্ধ নই—এখানে যা হয় সব জানি। কিন্তু আপনার সুবিধা হল আপনাকে দেখার কেউ নেই।

ম্যানেজার : (চীৎকার করে) একদম চুপ কর, বেইমান। বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরোও—।

মোটরওয়ালা : ভীষণ বকবকে লোকটা। মিস্তিরী তো নয়—স্বয়ং মূর্তিমান মাথাব্যথা। একে রেখেছিলেন কেন এখানে?

ম্যানেজার : বলবেন না দাদা, এদের জন্যে এতো ভাবি, কষ্ট লাগে এদের জন্যে,... নয় তো কবেই এ বদমাসগুলোকে—

বসন্তরাম : আমাদের জন্য তো ভেবে ভেবে ঘুম নেই। আমার ভুখা বাচ্চাগুলোর মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিলেন—

স্ত্রী : ম্যানেজার সাহেব, এর চাকরীটা খাবেন না, কোথায় যাবে বেচারা ? কি করবে।

মোটরওয়ালা : তুমি চুপ করো তো।

ম্যানেজার : শুনেছেন দিদি, কি লম্বাচওড়া কথা বেইমানটার।

বসন্তরাম : কেটে ছেঁটে ছোট করে দিন। আমার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে আপনি বেইমান—মিথ্যে বিল বানাচ্ছেন, লুটে খাচ্ছেন।

(স্যুট পরিহিত একজনের প্রবেশ—ইনি বীমা কোম্পানীর ম্যানেজার)

বীমা ম্যানেজার : হ্যালো ম্যানেজার সাহেব। কিছু মনে করবেন না, একটু দরকারে বিরক্ত করছি। আপনি বাড়রা সাহেবের গাড়ি সারানোর যে বিল দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে হেডকোয়ার্টার থেকে বার-বার বিস্তারিত খবর চেয়ে পাঠাচ্ছে। সেই ব্যাপারেই খোঁজ নিতে এলাম।

ম্যানেজার : (ঘাবড়ে গিয়ে) ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝলাম না।

বীমা ম্যানেজার : ব্যাপারটা হলো বাড়রা সাহেবের এক্সিডেন্ট হওয়া গাড়ি সারানোর জন্য 649 টাকার বিল দিয়েছিলেন সেই ব্যাপারেই আমায়...

ম্যানেজার : ও আচ্ছা আচ্ছা। ঐ ব্যাপারে। এখন তো ভীষণ ব্যস্ত রয়েছি। কাল আমি নিজেই আপনার অফিসে গিয়ে সবকিছু আপাকে বুঝিয়ে আসব।

বীমা ম্যানেজার : নিশ্চয়ই আসবেন কিন্তু, নয়ত আমাকে আবার আসতে হবে।

ম্যানেজার : চিন্তা করবেন না। সব আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেব।

(বীমা ম্যানেজারের প্রস্থান)

বসন্তরাম : (কপট হাসি) স্যার ওটা বোঝানোর জন্য আমিও সঙ্গে যাবো। ডায়নামোটা তো আমিই সারিয়েছিলাম—মানে নতুন লাগিয়ে-ছিলাম।

মোটরওয়ালা : ম্যানেজার সাহেব একটা কথা বলি শুনুন। আপনার এখানে যতগুলো বেইমান মিস্তিরী সবকটাকে বের করে দিন, নয় তো ওয়ার্কশপের বদনাম হয়ে যাবে।

বসন্তরাম : এটা ভালো বুদ্ধি বাৎলেছেন। মনে হচ্ছে আপনি কোনো সরকারী অফিসার। একটা সরকারী আদেশ জারী করে দিন না যাতে মিস্তিরীদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, সব নিজের থেকে মরে বসে থাকবে। মিস্তিরীও থাকবে না, বেইমানীও হবে না।

মোটরওয়ালা : উঃ, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা ম্যানেজার সায়েব চলি, আর অপেক্ষা করা মুশকিল। (স্ত্রীকে) চলো যাওয়া যাক।

ম্যানেজার : (মিস্তিরীকে) চুপ করো অসভ্য, বেইমান কোথাকার। বেরিয়ে যাও এখান থেকে। (মোটরমালিককে) আমি সত্যি খুব লজ্জিত, কিন্তু আপনি রাগ করবেন না। এই বেইমানীর কাঁটাটাকে আমি পাকাপাকি ভাবে উঠিয়ে ফেলেছি। ভবিষ্যতে এখানে এলে একে আর দেখবেন না। আপনার যে কষ্ট হল তার জন্যে ক্ষমা চাইছি আমি।

(মোটরমালিক আর তার স্ত্রী প্রস্থানোদ্যত—ঠিক
এই সময়েই একজন পুলিশ ইন্‌সপেক্টর প্রবেশ
করে। ওরা তাকে দেখে এবং প্রস্থান করে)

ইন্‌সপেক্টর : রায় সাহেব জ্বালাদাস এখানে এসেছিলেন?

ম্যানেজার : বলুন, কি ব্যাপার? ওঁরা তো এক্ষুণি বেরিয়ে গেলেন। দরকার থাকে তো বলুন—ডাকছি। (চেয়ার দেখিয়ে) বসুন।

(ম্যানেজার দরজার সামনে এসে চেঁচিয়ে ডাকেন : 'রায়
সাহেব, রায় সাহেব—একটু আসুন, এক মিনিটের
জন্যে—।' মোটরওয়ালার পুনঃপ্রবেশ)

মোটরওয়ালা : কি হল? খুব দেরী হয়ে গেছে, বলুন কি ব্যাপার?

ম্যানেজার : ইন্‌সপেক্টর সাহেব আপনাকে ডাকছিলেন।

ইন্‌সপেক্টর : নমস্কার। আজ অপনাকে অনেক খুঁজে শেষ

অবধি এখানেই পেলাম।

মোটরওয়ালা : আপনার খুব কষ্ট হয়েছে—এত ঘুরতে হল, বলুন কি ব্যাপার ?

ইন্সপেক্টর : আজ্ঞে, ঘোরাই তো আমার কাজ। (একটা কাগজ বের করে) আপনার নামে একটা ওয়ারেন্ট আছে। হ্যাঁ...

মোটরওয়ালা : (ঘাবড়ে কথায় বাধা দিয়ে) ওয়ারেন্ট ? আমায় গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট ?

ইন্সপেক্টর : আপনার গ্রেপ্তারের নয়। আপনার গাড়ি দখলের। (সিটি বাজায়) ড্রাইভার, ড্রাইভার

(পুলিশের পোশাক পরা ড্রাইভারের প্রবেশ)

শোনো, রায় সাহেবের গাড়িতে গিয়ে বোসো। রায় সাহেব দয়া করে গাড়ির চাবিটা দেবেন।

মোটরওয়ালা : ব্যাপারটা কি ? কি হয়েছে? আমার গাড়ি আপনি নিয়ে যাচ্ছেন কেন ?

ইন্সপেক্টর : পুলিশের গুপ্তচর-বাহিনীর খবর অনুযায়ী আপনি গাড়িটা ঘুষ হিসেবে নিয়েছেন। এখন প্রাথমিক তদন্ত চলছে। গাড়ি আপাতত পুলিশের জিম্মায় থাকবে।

বসন্তরাম : আজ্ঞে গাড়ির ডীপারটা আমি ঠিক করে দিয়েছি।

মোটরওয়ালা : চুপ করো বেইমান।

(মোটরওয়ালার সংলাপের সঙ্গে সঙ্গেই যবনিকা নেমে আসে।)

নিয়তি

—সন্ত সিংহ সেখোঁ

চরিত্রলিপি

মান সিং : মহারাজা গঙ্গাপুর

বিজয় সিং : যুবরাজ

বিশ্বনাথ : মন্ত্রী

রাজেশ্বরী : বিষক্রিয়া থেকে বেঁচে যাওয়া ভানপুরের মহারানী, বর্তমানে রাজা মান সিংয়ের আশ্রয়-প্রার্থিনী।

[রাজভবনের একটি কক্ষ। রাজমহলের যে কোনো কক্ষ যেমন সাজানো থাকে এটিও তেমনি আসবাবে সজ্জিত। মহারাজা মানসিংয়ের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ এবং যুবরাজ বিজয় সিং খুব গম্ভীর আলোচনায় মগ্ন···]

বিজয় সিং : মন্ত্রীমশাই, এটা কিন্তু খুব লজ্জার ব্যাপার যে রাজকুমারীর এখন ষোলো বছরও বয়স হয় নি।

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ, আর উনিও যে বলছেন উনি ভানপুরের রাজবাড়ির সেটাও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। সকলেই জানে যে রাজার পরাজয়ের পর রাজ অন্তঃপুরের সমস্ত রমণীরা বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন।

বিজয় সিং : আমি কিন্তু বিশ্বাস করি ইনি ভানপুরের রাজবাড়িরই। এঁর বর্ণিত প্রত্যেকটি কথাই সত্য।

বিশ্বনাথ : আপনি কেমন করে জানলেন কুমার ?

বিজয় সিং : রাজেশ্বরী এ কথার প্রমাণ আমাকে দিয়েছেন। তা ছাড়া মন্ত্রীমশাই, একজন রানীই রাজেশ্বরীর মতন, সুন্দরী, সভ্য এবং হুঁশিয়ার হতে পারেন।

বিশ্বনাথ : ঠিক আছে। বয়স অনুপাতে রানী সত্যিই সুন্দরী। রাজবাড়ির আচার-আচরণ ছাড়া এই বয়স পর্যন্ত এমন সৌন্দর্য ধরে রাখা সম্ভব নয়। আমার তো মনে হয় ওঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে।

বিজয় সিং : না না, বড়ো জোর পঁয়ত্রিশ। ব্রজেশ্বরীর যখন জন্ম হয়, ওঁর বয়স তখন মাত্র আঠারো।

বিশ্বনাথ : উনি যেভাবে নিজের সৌন্দর্য ধরে রেখেছেন তা দেখে আমার আশ্চর্য লাগে। মেয়েদের মা হওয়ার ইচ্ছেটায় যদি এত তাড়াহুড়ো না থাকে তা হলে···

বিজয় সিং : (তাড়াতাড়ি বলে) কিন্তু মন্ত্রীমশাই, এ ব্যাপারটা ঠিক আমাদের বিচার্য নয়। আমরা রাজেশ্বরীর বয়স বা সৌন্দর্যের আলোচনা করার জন্যে মিলিত হই নি।

বিশ্বনাথ : না না, আমরা ব্রজেশ্বরীর বয়স বিচার করতে বসেছি। ওঁর সৌন্দর্যও আমাদের আলোচ্য নয়, অবশ্য ও—ও খুবই সুন্দরী। আমি আপনার পিতার দুর্বলতার কথা ভালো করেই জানি—সত্যি কথা বলতে কি, উনি সর্বদাই সৌন্দর্যের পিয়াসী, ভ্রমরের মতো। রাজকুমারীর মধ্যেও তার মায়ের রূপের ছাপ পড়েছে।

বিজয় সিং : এমন এক সুন্দরীর মেয়ে কি করে কম সুন্দরী হবে? যৌবনে রাজেশ্বরীর বোধহয় সৌন্দর্যের সীমা ছিল না। আমি এখনও ভাবতে পারছি না—এর থেকে বেশি সুন্দর কি করে হতে পারে?

বিশ্বনাথ : (থেমে থেমে) হ্যাঁ, মা-মেয়ে দুজনেই সমান রূপসী।

বিজয় সিং : হ্যাঁ, কিন্তু এটাও আমাদের আলোচ্য নয়।

বিশ্বনাথ : (স্তম্ভিত হয়ে) না, এও নয়। আমাদের আলোচ্য হলো—

বিজয় সিং : সত্যিই খুব লজ্জার কথা—পিতা পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ হয়েও ষোলো বছরের এই যুবতীর প্রেমাসক্ত হয়েছেন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, ব্রজেশ্বরীর বয়স এখনও বোধহয় ষোলো হয় নি—।

বিশ্বনাথ : কুমার, এ কিন্তু আপনার অন্যায়। আপনার পিতার বয়স মোটেই পঞ্চাশ নয়, পঁয়তাল্লিশ।

বিজয় সিং : (হেসে) কি এসে গেল তাতে? পঁয়তাল্লিশ বছরের কোনো লোকের পক্ষেও এটা সমানই লজ্জার ব্যাপার।

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ, আমি মানছি—এটা সত্যিই লজ্জার কথা।

বিজয় সিং : এই বয়সের তো ওঁর নাতি-নাত্‌নীই রয়েছে। এই বয়সের কোনো মেয়ের প্রতি তাঁর পিতৃস্নেহ দেখানো উচিত।

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ, আপনার কথা অনেকটাই ঠিক। আমার তো মনে হয় আপনার বোনের বয়সই বোধহয় আট বছর।

বিজয় সিং : মাত্র আট বছর? না বোধহয়, দশ। নিশ্চয়ই দশ। আমি গুণে বলে দিচ্ছি···হুঁ···হাঁ···আট বছরের থেকে কয়েক মাস

বেশি। তা হলে আমার কথাই ঠিক। মন্ত্রীমশাই, এটা সত্যিই খুব লজ্জার ব্যাপার—আপনার এ নিয়ে চিন্তা করা উচিত।

বিশ্বনাথ : (মাথা চুলকে) হ্যাঁ, আমিও সেই কথাই ভাবছি। আপনার পিতার শেষ বিবাহও তো পাঁচ বছর হয়ে গেল।

বিজয় সিং : হ্যাঁ, খুব জোর পাঁচ বছর। আর মায়ের বয়স এখনও পঁচিশ হয় নি। আমি তখন ছোট ছিলাম। আপনি তখন এই বিবাহের বিরোধিতা করেন নি ?

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ, আমি যথেষ্ট বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু উনি এতই আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কোনো আপত্তি টেকে নি। বল্লাম না, উনি সৌন্দর্যের ভ্রমর ! এই ওঁর ভাগ্য, নিয়তি !

বিজয় সিং : এ ধরনের ঘটনা থেকে আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই আমি।

বিশ্বনাথ : ওঁর সত্যিই ভীষণ আসক্তি এসব ব্যাপারে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ওঁর কামাবেগ আসে। এই শেষের আগের বিয়েটা যেন কবে হয়েছিল। হ্যাঁ, আমার হিসেবে প্রায় বছর দশেক হবে। আপনার বোধহয় তখন বছর বারো বয়েস।

বিজয় সিং : কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে ওঁর এই কামাসক্তিটা সংযত করার চেষ্টা করা উচিত। দেখুন না মায়ের বয়স বছর পঁচিশেক, এই বয়সে এতবড় একটা আঘাত—

বিশ্বনাথ : আর আগেও এই বয়সেই আর এক জনকেও আঘাত দিয়েছেন। সেই রাজমাতার বয়সও বড়জোর বছর তিরিশেক ছিল।

বিজয় সিং : তখন তো আমি কিছুই বুঝতাম না, কিন্তু এবার আমি খোলাখুলি ভাবেই এর বিরোধিতা করব। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সী কোনো যুবতীকে এইভাবে আঘাত দেওয়া—

বিশ্বনাথ : আপনার বিরোধিতার কারণ কি মায়ের যৌবন কিংবা, কি বলব, ব্রজেশ্বরীর কৈশোরত্ব ?

বিজয় সিং : মন্ত্রীমশাই, আজ একটু বেশি গম্ভীর রয়েছেন। যাইহোক, আমি চাই না যে আমার পিতা আমার জন্যে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাবেন দুঃখী সৎ-মায়েদের, তা ছাড়া এও ভাবতে খুব

খারাপ লাগছে যে ব্রজেশ্বরীর মতো অবলা একটা মেয়ে তাঁর কামনার শিকার হবে।

বিশ্বনাথ : কামনা, হ্যাঁ কিন্তু রাক্ষসী কামনা নয়। কুমার, আজ আপনি একটু বেশি উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

বিজয় সিং : আপনি কিন্তু আমার ব্যথাটা বুঝতে পারছেন না। আমি ব্রজেশ্বরীকে নিজের ছোট বোন, না মেয়ে বলে মনে করি। ও এতই সরল যে ওর বয়স ষোলো বলেও মনে হয় না। আমার মনে হয় ও এসমস্ত কিছুই বোঝে না। ওকে যদি মা-কালীর সামনে বলির পশুর মতো উৎসর্গ করা হয় তাও সহ্য করতে পারি, কিন্তু আমার পিতার কাছে উৎসর্গীকৃত না হয়।

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ, আপনার পিতা কোনো দেবতা নন।

বিজয় সিং : হ্যাঁ, তিনি মানুষ। তাঁর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে বোঝা উচিত। ওঁর এই পাগলামিটা অমানুষিক।

বিশ্বনাথ : এটা সত্যিই চিন্তার বিষয়। কিন্তু রাজারা তো মানুষ নন।

বিজয় সিং : আমি তো মানুষ।

বিশ্বনাথ : আপনি তো এখনও যুবরাজ। আপনি কিন্তু একথা ভাববেন না যে এ ব্যাপারে আমি আপনার পিতার নিন্দা করি না।

বিজয় সিং : (তীব্র আক্রোশের স্বরে) কিন্তু আপনি তাঁকে বাধা দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করছেন না।

বিশ্বনাথ : সেই সম্বন্ধেই তো চিন্তা করছি।

বিজয় সিং : কোথায়, চিন্তা তো করছেন না।

বিশ্বনাথ : না না কুমার, আমি সত্যই গভীরভাবে এ বিষয়ে ভাবছি, কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

বিজয় সিং : আমার ভয় হয় আপনি আগের বারের মতো এবারও ভবিতব্যের কাছে হার মানবেন।

বিশ্বনাথ : না কুমার, আগে ছিলাম একা, এখন রয়েছি আমরা দুজন। মনে হয় আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।

বিজয় সিং : আমি তো শপথ করেছি—।

বিশ্বনাথ : ব্রজেশ্বরী নিতান্তই কিশোরী, এ ব্যাপারে ওর কোনো কথাই খাটবে না। আপনি তো বললেন, ওকে আপনি নিজের মেয়ের মতো দেখেন।

বিজয় সিং : নিশ্চয়ই।

বিশ্বনাথ : কুমার, আমার তো মনে হয় আপনার লক্ষণও শুভ নয়। আপনার বয়স বাইশ, ব্রজেশ্বরীর ষোলো। আপনার ভবিতব্যও কিছু আশ্চর্যজনক লাগছে।

বিজয় সিং : এ ব্যাপার নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না মন্ত্রীমশাই। আমার চোখে ব্রজেশ্বরী ছোট বোনের মতন।

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ, এটা ঠিক। কি ভালো হতো বলুন তো যদি আপানার পিতা রাজেশ্বরীকে দেখে মোহিত হতেন—তা হলে মানা-তোও ভালো।

বিজয় সিং : না, তাও না—আমার পিতার কোনো নারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

বিশ্বনাথ : প্রয়োজনের কথা বলছি না। আসক্ত হওয়ার কারোরই প্রয়োজন নেই, আপনার পিতার তো সবচেয়ে কম। কিন্তু এটা ওঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আপনি কিন্তু ভাববেন না যে উনি রাজেশ্বরীর প্রতি আসক্ত হলে আমি প্রশংসা করতাম।

বিজয় সিং : হ্যাঁ, আমিও তাই চাই।

বিশ্বনাথ : আপনি পরামর্শ দিন, ওঁকে কি করে বাধা দেওয়া যায়।

বিজয় সিং : পরামর্শের জন্যে আমারাই তো আপনার কাছে যাই।

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ, যখন আমরা দিই তখন হয় পরামর্শ, যখন নিই তা হয়ে যায় রায়, আদেশ। আমার আদেশ চাওয়া উচিত ছিলো। (হেসে)

বিজয় সিং : এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য আপনি ওঁর কাছে পৌঁছে দিন। ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পর্কে ওঁকে বলুন। দু-চার বার মাথা নাড়িয়ে বলুন যে এ রকম হওয়া উচিত নয়। এইভাবেই আপনারা ওঁকে দোষ থেকে, স্খলন থেকে রক্ষা করতে পারেন। (হেসে)

(দরজায় সান্ত্রীকে দেখা যায়)

বিশ্বনাথ : ভেতরে এসো দ্বারপাল!

(সান্ত্রী এগিয়ে এসে ওঁর হাতে চিঠি দেয়, মন্ত্রী তা তাড়াতাড়ি পড়ে নেন)

হ্যাঁ, ওঁকে ভেতরে আসতে দাও।

(রাজেশ্বরীকে স্বাগত জানাবার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে আসেন)

সু-স্বাগতম্ মহারানী,

(রাজেশ্বরীকে ভেতরে আনা হয়। বিজয় সিং নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন)

হঠাৎ কি ভেবে এদিকে এলেন মহারানী ?

রাজেশ্বরী : মন্ত্রীমশাই ঘোরতর অন্যায় হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে বিষক্রিয়া থেকে বাঁচাটাই আমার ভুল হয়েছে, ঈশ্বর তার শাস্তি দিচ্ছেন আমাকে।

বিশ্বনাথ : মন শক্ত করুন মহারানী। আপনি আপনার সুন্দরী কন্যাকে আগুনে জ্বলা থেকে বাঁচিয়ে পুণ্যকর্ম করেছেন। এর জন্যে যদি আমাদের দেবতাদের কাছে স্বাক্ষী দিতে হয়—তাতেও আমরা প্রস্তুত।

রাজেশ্বরী : দেবতা কিম্বা দেবতাস্থানীয় পুরুষই তাকে নষ্ট করার জন্যে উদ্‌গ্রীব। একে বাঁচাতেই আমি আমার নিজের জীবন বিপন্ন করেছি।

বিজয় সিং : আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্যেই এখানে মিলিত হয়েছি।

রাজেশ্বরী : আমি আপনাদের এখানে একত্রে বসার খবর পেয়ে নিজের ব্যথার কথা জানাতে এসেছি।

বিশ্বনাথ : আপনার তো অধিকার আছে, মহারানী।

রাজেশ্বরী : আমি ঐ মেয়েকে অগ্নি-দেবতার কামনা থেকে বাঁচি-য়েছি, এখন আপনারা ওকে মহারাজের কামনাগ্নি থেকে বাঁচান।

বিজয় সিং : নিজের রক্ত দিতে হলেও ওকে আমি বাঁচাবো।

বিশ্বনাথ : (কানের উপর হাত রেখে) শান্ত হোন কুমার। আমি আমার প্রভু, মহারাজ মান সিংকে এভাবে অসম্মানিত হতে দেখতে অভ্যস্থ নই।

বিজয় সিং : মন্ত্রীমশাই, কঠোর শব্দ ব্যবহার করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। এটা একটা রাজকীয় উপদ্রব।

বিশ্বনাথ : কঠোর শব্দের পরিবর্তে আমরা অন্য পথ খোঁজার চেষ্টা করতে পারি।

রাজেশ্বরী : হ্যাঁ, যদি আপনি সহায়তা করেন। কুমার, আমার অনুরোধ, আপনি মন্ত্রীমশাইয়ের কথা মন দিয়ে শুনুন।

বিশ্বনাথ : মহারানী, আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, আপনি প্রথমে আপনার রায় দিন। আপনার মতে আমাদের এখন কি কর্তব্য ?

রাজেশ্বরী : আমার মনে হয়, আপনারা আমাকে উধম নগরের রাণা রবিন্দর সিংয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। আমার কন্যা, রাণা রবিন্দরের বাগ্‌দত্তা। আমার পতির যুদ্ধ-যাত্রার একদিন পূর্বেই তিনি ভানপুরে এসেছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, আমার স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আর একথা আমার রাজনারী হওয়ার প্রমাণও তো বটে। আপনাদের যদি বিশ্বাস না হয় এই দেখুন রবিন্দরের চিঠি। (মন্ত্রীর সামনে চিঠি রাখতে রাখতে)

বিশ্বনাথ : আপনাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই মহারানী। আপনি সর্বাঙ্গীণ ভাবেই এক রাজপুরনারী, তার প্রমাণ দিতে চিঠি দেখানোর কি প্রয়োজন। কুমার, আমারও মনে হয় এঁকে উধম নগরে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

রাজেশ্বরী : এটা এত সহজ নয় মন্ত্রীমশাই। আমাকে এখান থেকে লুকিয়ে পালাতে হবে।

বিশ্বনাথ : (মাথা নাড়িয়ে) না না, আপনি লুকিয়ে পালাবেন কেন ? মহারানী, আপনার ও আপনার মেয়ের জন্যে আমি আমার প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তো করতে পারি না। মহারাজ আপনার এখান থেকে চলে যাওয়ার বিরুদ্ধে কেন ?

বিজয় সিং : যেমন কামনায় তাড়ায় ষাঁড়…

বিশ্বনাথ : (কানে হাত ঢেকে যেন শুনতে চায় না) কি কারণ?

বিজয় সিং : কারণ আর কি, কামনাই আসল।

বিশ্বনাথ : তবু, একটা ছুতো তো চাই।

রাজেশ্বরী : ছুতো, ছুতো আমার দুর্ভাগ্য। আমার মেয়ে বলে রবিন্দরের কাছে কখনো যাবে না—ও আমাদের ভানপুরে, ছেড়ে চলে এসেছিল।

বিশ্বনাথ : বাচ্চা মেয়ে। ওকি ভাবছে যুদ্ধে রবিন্দরের অংশ গ্রহণ করা উচিত ছিল।

রাজেশ্বরী : হ্যাঁ, ও তাই বলে।

বিশ্বনাথ : মহারানী, আমার মনে হয় ওঁরা ঠিকই করেছেন। আপনার মেয়ে বিষপানে মৃত্যুর থেকে বেঁচেছেন, আর তাঁর বাগ্‌দত্তা স্বামী লড়াইয়ে মৃত্যুর থেকে বেঁচেছেন— এতো ঠিকই হয়েছে।

রাজেশ্বরী : আমি আমার মেয়েকে পালিয়ে আসতে বাধ্য করেছি। ও তো আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরার জন্যে উৎসুক ছিলো।

বিশ্বনাথ : উনি কি ওঁর সম্বন্ধে মহারাজের আসক্তির কথা জানেন?

রাজেশ্বরী : হ্যাঁ, ও জানে। কিন্তু ও নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতেই পারে না। ও রবিন্দরের কাছে যেতে ঘৃণাবোধ করে, তার চেয়ে ও দ্বারপালের সঙ্গে থেকে যেতেও ওর আপত্তি নিই।

বিশ্বনাথ : যাকে মহারাজা চান, তার দ্বারপালের সঙ্গে থাকার কি প্রয়োজন?

রাজেশ্বরী : মন্ত্রীমশাই, আমার সব দুর্ভাগ্যের মূলে আমার এই মেয়ে। যদি সুলতানের ছেলের সঙ্গে এর বিয়ে দিয়ে দিতাম। তাহলে এসব ঘটতো না।

বিজয় সিং : (নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে) রাজেশ্বরী, আপনি একথা ভাবতে পারলেন?

রাজেশ্বরী : না না, কুমার কক্ষণো নয়, আমি আমার সবকিছু ত্যাগ করেছি, কিন্তু নিজের সম্মানের কথা কখনো ভুলতে পারি না।

বিজয় সিং : এখন আমার পিতা একজন সুলতান তৈরি হচ্ছেন।

এক ভীরু, কাপুরুষ সুলতান।

(বিশ্বনাথ শুনতে চান না, তাই কানে হাত রাখেন
এবং রাজেশ্বরীকে চোখের ইশারায় বিজয়
সিংকে বাইরে পাঠাতে বলেন।)

রাজেশ্বরী : কুমার, আপনি বড়ই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আমার অনুরোধ আপনি একটু পাশের ঘরে যান, আমবা এই বিষয় একটু আলোচনা করে নিই।

বিজয় সিং : ঠিক আছে, যাচ্ছি। (উঠতে থাকে)

রাজেশ্বরী : (বিনম্রভাবে) আপনি রেগে গেলেন না তো কুমার?

বিজয় সিং : (যেতে যেতে) না না।

(প্রস্থান)

রাজেশ্ববী : (লজ্জায় কিছুক্ষণ নীরব থাকে) ঠিক আছে তো মন্ত্রী-মশাই।

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ, একেবারে ঠিক। এবাব সোজাসুজি আলোচনা করা যাক। আপনার কন্যা কি মহারাজেব প্রেমকে স্বীকাব করেন না?

রাজেশ্বরী : এর কারণ তো আপনাকে আগেই বলেছি।

বিশ্বনাথ : না, রবিন্দরের ভীরুতা এর কারণ নয়, এব কারণ হলো ঈর্ষা।

রাজেশ্ববী : ঈর্ষা কেন? আপনি আমার থেকে বেশি জানেন বলে মনে হচ্ছে।

বিশ্বনাথ : উনি নিরাশ হয়েছিলেন কুমারের দিক থেকে। আপনি আমার খোলাখুলি কথায় কিছু মনে করছেন না তো?

রাজেশ্ববী : না না, মনে করার কি আছে। ওকে নিরাশ করার অধিকার কুমারের নিশ্চয়ই আছে।

বিশ্বনাথ : কিন্তু ব্রজেশ্বরীর মতো রূপসী ও অভিমানিনীকে নিরাশ করা তো সোজা কথা নয়। আপনি তো জানেনই রাণা রবিন্দরের কাছ থেকে নিরাশ হওয়ার ফল কি হয়েছে। (কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব)

আপনি কি কুমারকে ব্রজেশ্বরীর প্রেমকে স্বীকার করতে, অনুপ্রাণিত করতে পারেন না। আমার তো মনে হয় আপনার মতো গুণবতীর পক্ষে এ কাজ শক্ত নয়। যদি আপনি কিছু মনে না করেন তো বলি—

রাজেশ্বরী ঃ বলুন, কি কথা।

বিশ্বনাথ ঃ মায়েরা প্রায়ই মেয়েদের প্রেমের ব্যাপারে সাহায্য করেন।

রাজেশ্বরী ঃ আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

বিশ্বনাথ ঃ যদি এ ঘটনা ঘটে তা হলে আপনার মেয়ে মহারাজের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করবেন। আর এও সত্যি যে মহারাজ যতই বাসনায় অভিভূত থাকুন না কেন নিজের ছেলের সঙ্গে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন না।

রাজেশ্বরী ঃ এ সব আমার হাতের বাইরে। বহু চেষ্টা করেছি, সবই ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্বনাথ ঃ (অবিশ্বাসী স্বরে) আপনি কুমারকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন? আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে অসফল হয়েছেন।

রাজেশ্বরী ঃ না, কথাটা তা নয়। আমি খুব মন দিয়ে ব্রজেশ্বরীর সমস্ত ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করেছি, আর এ প্রসঙ্গে সব দিক চিন্তা করে দেখার জন্যেও ওকে বহু বুঝিয়েছি।

বিশ্বনাথ ঃ মনে হয় ব্যাপারটার অন্য দিকটাও ওকে ভয় পাইয়েছে। আপনি ওর ঈর্ষা, আক্রোশগুলো চাপা দেওয়ার চেষ্টা করুন।

রাজেশ্বরী ঃ (আবেগ ভরা স্বরে) ঈর্ষা কিসের? কিসের আক্রোশ। (কাঁদে) ও আমাকে ঈর্ষা করে, কুমার ওকে মেয়ের মতো দেখেন, ওর সঙ্গে প্রেম করতে পারেন না। যদি জানতাম আমার নিজের মেয়ে আমার সঙ্গে সতীনেব মতো ব্যবহার করবে, তা হলে বিষ খাওয়ার পরিকল্পনা ছাড়তাম না। এখনও আমার প্রতি আক্রোশ-বশে, ঈর্ষা-বশে নিজের যৌবন এক দুরাচারী বৃদ্ধের কাছে লুটিয়ে দিল। হে ভগবান তোমার ন্যায়ের বিধান কি কঠোর!

বিশ্বনাথ ঃ মহারানী, আপনি কিন্তু আমার প্রভু মহারাজের প্রতি অন্যায় করছেন। আপনি জানেন এ ধরনের কথা শুনলে আমি কত

ব্যথা পাই।

রাজেশ্বরী : (সভয়ে) আমি দুঃখিত, কিন্তু মহারাজ কেন আমার মেয়ের ঈর্ষার সুযোগ নিচ্ছেন ?

বিশ্বনাথ : মহারাজ জানেন না যে ব্রজেশ্বরী ঈর্ষা-বশে এ সব করছে।

রাজেশ্বরী : না না, মহারাজ সব কিছুই জানেন।

বিশ্বনাথ : হয় তো উনিও আক্রোশ-বশে এ সব করছেন।

রাজেশ্বরী : কেন, মহারাজের এতে আক্রোশ কিসের ?

বিশ্বনাথ : কিছু মনে করবেন না, আমরা একটা খুব জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। যতই সঙ্কোচ করি না কেন, কঠোর শব্দ নিজের থেকে এসে যাচ্ছে। আর তা ছাড়া আমাদের আলোচনা যে পর্যায়ে এসেছে, সব কথা খুলে বলাই উচিত।

রাজেশ্বরী : কিছু চিন্তা করবেন না মন্ত্রীমশাই। আমি জানি আপনার কাছে কোনো কথাই লুকানো নেই।

বিশ্বনাথ : লুকানো, খোলাখুলি এতে কিছু এসে যায় না। কিছু মনে করবেন না, আপনি মহারাজ সম্বন্ধে যা ভাবেন ওঁরও আপনার সম্বন্ধে তেমনিই ধারণা।

রাজেশ্বরী : বেশ।

বিশ্বনাথ : কিন্তু তাতে তো পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না।

রাজেশ্বরী : আমি বুড়ীও নই, দুরাচারিণীও নই।

বিশ্বনাথ : কুমারের কথা মতো আপনার বয়স পঁয়ত্রিশ, আর··· আত্মহত্যা না করে পালিয়ে এসেছেন আপনি।

রাজেশ্বরী : আমার বয়স তিরিশ বছর। ব্রজেশ্বরীর পনেরো। আমার যখন পনেরো বছর বয়স তখনই ব্রজেশ্বরীর জন্ম।

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ, তা হলে আপনার আর কুমারের মধ্যে বয়সের তফাৎ মাত্র আট বছরের। আপনার মতো রূপসী গুণবতীর জন্যে আট বছরের তফাৎ আর কি এমন, কিন্তু মহারাজের তো এখানেই আপত্তি।

রাজেশ্বরী : আপনি আমায় গুণবতী বললেন বলে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, কুমারের কাছে আমি একটা কথাও

লুকোই নি।

বিশ্বনাথ : সে কথা ঠিক। কিন্তু আপনি এমন একটা ভুল চেপে গেছেন যেটা আপনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। কুমার আপনার বয়স, চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ভেবেছেন, অথচ আপনার বয়স মাত্র তিরিশ। কিন্তু মহারাজ···

রাজেশ্বরী : মহারাজ ধরে নিয়েছেন আমি একটা বুড়ী, চরিত্রহীন মেয়েছেলে।

বিশ্বনাথ : (হাতে করে কান ঢেকে) মহারানী, ঐ কথাগুলো আপনার জিভকে অপবিত্র করছে। আমার মনে হয়, মহারাজ আপনার আত্মহত্যা করতে গিয়ে পালিয়ে আসাটাকেই অশুভ বলে ধরেছেন।

রাজেশ্বরী : ব্রজেশ্বরীও তো আত্মহত্যা না করে পালিয়ে এসেছে।

বিশ্বনাথ : ওতো আপনার কথা মতোই করেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে নিজের বুদ্ধির কুশলতা দেখিয়েছেন সবচেয়ে বেশি, আর বললামই তো যে মহারাজ সব কিছুই ঈর্ষাবশে করছেন।

রাজেশ্বরী : হ্যাঁ, ঈর্ষাই আসল কারণ। কিন্তু ওঁর ঈর্ষা কিসের? আমি কি কুমারের যোগ্য নই। সুলতান তো আমার জন্যই এত বড়ো যুদ্ধটা করলো।

বিশ্বনাথ : কিন্তু কুমার তো সুলতানের থেকে অনেক ছোট।

রাজেশ্বরী : (আবেগ-মাখা স্বরে) কুমারের বয়স পঁচিশ—উনি নিজে আমাকে বলেছেন। পাঁচ বছর কি এমন? আমার জন্যে তো রাজধানীটাই গেল।

বিশ্বনাথ : প্রেমের ব্যাপারে একশো বছর হলেও কিছু এসে যায় না।

রাজেশ্বরী : হ্যাঁ, কুমার আমায় ভালবাসেন, আমিও ভালবাসি ওঁকে। আমার কারো প্রতি ঈর্ষা নেই, রাগ নেই।

বিশ্বনাথ : হয়তো অন্য পক্ষেও কোনো ঈর্ষা নেই।

রাজেশ্বরী : কে বললো নেই, ঈর্ষা, আক্রোশ, জিদ। আপনিই তো

একটু আগেই বললেন।

বিশ্বনাথ : আমি আর কতটুকু জানি মহারানী। আমার তো সবই অনুমান। হয়তো এও হতে পারে আসল প্রেমই সবকিছু করাচ্ছে। আমি, আপনি তুজনেই বিশ্বাস করি প্রেমের ব্যাপারে বয়সটা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না।

রাজেশ্বরী : না না, হতে পারে না। আমি কিছুতেই মানতে পারি না যে ব্রজেশ্বরী মহারাজকে ভালবাসে। মন্ত্রীমশাই, আমি বুঝতে পারছি আপনি মহারাজের পক্ষ নিচ্ছেন, কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে কেউ কিছু করতে পারবে না। (সক্রোধে) মহারাজ যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করেন, আমিও বদলা নিতে জানি। গঙ্গাপুর তো সুলতানের চেয়ে বিশেষ দূর নয়।

বিশ্বনাথ : কিন্তু আপনি কুমারকে ভালবাসেন এটা মনে রাখ-বেন। আর কুমারের প্রেমিকার মুখে এই কথা?

রাজেশ্বরী : (বিব্রত স্বরে) কুমার কোথায়? ওদিকে গেলেন নাকি?

(রাজেশ্বরী পাশের ঘরে চলে যান। মন্ত্রী
কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করতে থাকেন।
মহারাজ মান সিংয়ের প্রবেশ।
মন্ত্রী তাঁকে স্বাগত জানাতে
এগিয়ে যান।)

মান সিং : মন্ত্রী, কুমারের সাথে দেখা হয়েছিল?

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ প্রভু, একবার হয়েছে।

মান সিং : আপনার উপদেশের কোনো ফল হয়েছে। সব কথা খুলে বলেছেন তো ওঁকে?

বিশ্বনাথ : সত্যি কথা বলতে কি, অর্ধেক কথা হয়েছে। এমন সময়···

মান সিং : কি হয়েছে?

বিশ্বনাথ : রানী রাজেশ্বরী এসে পড়েন।

মান সিং : হুঁ। তার মানে জাল এতোদূর পর্যন্ত ছড়ানো হয়েছে বুড়ী হরিণী নিশ্চয়ই জালে ধরা পড়ে নি। তা হলে তো তিন জনেরই

একসাথে কথা হয়ে গেছে ?

বিশ্বনাথ : না কুমার কোনো কারণে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

মান সিং : (সহাস্যে) বাহ্, তার মানে বুড়ী হরিণী জালে ধরা ঠিক পড়লই। বুঝতে পারছি না, আপনি এ ব্যাপারে কি করলেন ?

বিশ্বনাথ : এ সব মহিলাদের থেকে হরিণী অনেক বেশি বিচক্ষণ। আর তা ছাড়া যুবক হরিণরা নিজেরাই যখন ধরা দেবার জন্যে ছটফট করছে তখন হরিণীকে আর কে ধরতে চাইবে বলুন ?

মান সিং : ঠিক ধরা পড়ার জন্যে একেবারে মুখিয়ে আছে। ব্রজেশ্বরী আমাকে কি খবর পাঠিয়েছে শুনবেন নাকি ?

বিশ্বনাথ : বলুন মহারাজ।

মান সিং : ওর মা ওকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছে, তাই আমাকেও তাড়াতাড়ি করতে হবে।

বিশ্বনাথ : ব্রজেশ্বরী কি জানে এ বয়সে তাড়া-হুড়ো হয় না।

মান সিং : (সস্নেহে গালে টোকা মারে) বুড়ো, চালাক ব্রাহ্মণ— তোমার বয়স আমার থেকে পাঁচ বছর বেশি।

বিশ্বনাথ : এসব হাসি-ঠাট্টার কথা এখন থাক মহারাজ। আপনি কি আপনার এই বাসনা ত্যাগ করতে পারেন না ?

মান সিং : তা হলে কি কুমার আর ব্রজেশ্বরীর পথ পরিষ্কার হয় ?

বিশ্বনাথ : কুমারকেও ব্রজেশ্বরীর প্রেমের থেকে দূরে সরানো যায়। এই মা-মেয়েকে যথাশীঘ্র উধমপুর পৌঁছে দিলে কেমন হয়? মেয়েরা নিয়তির হাতের অস্ত্র। মহারাজ, আমার ভয় করে। ভানপুর এদের জন্যে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এরা যতই দূরে থাকে গঙ্গাপুরের ততই মঙ্গল।

মান সিং : কিন্তু নিয়তির থেকে প্রেমের প্রবণতা যে বেশি মন্ত্রী।

বিশ্বনাথ : প্রেম নিয়তিরই বিকৃত রূপ।

মান সিং : মান সিং রাজপুত। প্রেমের পথে সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর করার ক্ষমতা তার আছে।

বিশ্বনাথ : মহারাজ, এক তরফা প্রেমের জন্যে এ রকম বলিদান

ঠিক হবে না।

মান সিং : কার প্রেম একতরফা। তুমি কি ভাবছো ব্রজেশ্বরী আমায় ভালবাসে না ? কেন না আমার বয়স চল্লিশের বেশি ? আমি তো আর ব্রাহ্মণ নই যে চল্লিশ পার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই 'বেকার' হয়ে যাব। আমি রাজপুত, আর ব্রজেশ্বরীও তার মূল্য বোঝে। সুন্দরীরা বীরদের ভালবাসে, বয়সকে নয়।

বিশ্বনাথ : কিন্তু আপনার কাছে দাসীর দেওয়া খবর ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ আছে ? দাসীরা নিজেদের কর্তব্য কি ভালো করে জানে ?

মান সিং : আমি জানি। দাসীর প্রতি আমার বিশ্বাস আছে।

বিশ্বনাথ : জানি মহারাজ। এই দাসীই আপনার আর রানী চন্দ্রাবতীর মধ্যে খবর আদান-প্রদান করতো। কিন্তু তখন মহারাজের বয়স আজকের থেকে পাঁচ বছর কম ছিলো, আর রানী চন্দ্রাবতীর বয়সও ছিলো পঁচিশের আশেপাশে।

মান সিং : ব্রজেশ্বরীও এমন বাচ্ছা নয়, আঠারো বছরের উপর ওর বয়স। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বয়স নিয়ে কিসের চিন্তা। প্রেমিক আর রাজপুতদের বেলায় বয়সে কিছু এসে যায় না।

বিশ্বনাথ : আর নিয়তি ?

মান সিং : এতো ভয় কিসের ? পাঁচ বছর আগে সুলতান যখন আমাদের আক্রমণ করেছিলো তখন তো তুমি এতো ভয় পেতে না। তখন আমি চন্দ্রাবতীকে বিয়ে করেছিলাম। আমার বীরত্ব দেখে সুলতান নিজের মত বদলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। আর এখন তুমি এক নারীকে ভয় পাচ্ছ।

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ রাজন্। এই নারীই নিয়তির হাতের অস্ত্র। আমি কাছ থেকে কখনো ব্রজেশ্বরীকে দেখি নি, কিন্তু রাজেশ্বরীকে যেটুকু জানি তার ভিত্তিতেই আপনাকে বলছি এদের থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকুন।

মান সিং : আচ্ছা, তার মানে রাজেশ্বরী তোমার মনে সত্যিই ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। নাকি ওকে দেখে মোহিত হয়ে যাও নি তো ?

বিশ্বনাথ : মহারাজের এই সেবককে মোহ কোনোদিন জয়

করতে পারি নি। কিন্তু তবু ভয়-ডর আমি সত্যি-সত্যিই পাই—এটুকু স্বীকার করার সৎ-সাহস আমার আছে।

মান সিং : ভয় ? রাজেশ্বরীকে ?

বিশ্বনাথ : নিয়তিকে।

মান সিং : প্রেম নিয়তির থেকে বেশি শক্তিশালী, আর প্রেম আমার স্বপক্ষে। ব্রজেশ্বরী আর মান সিং দুজন দুজনকে ভালবাসে—নিয়তির সঙ্গে লড়াই তাঁরা করতে পারে।

বিশ্বনাথ : নিয়তিরই অন্য নাম প্রেম মহারাজ।

মান সিং : রাজেশ্বরীকে ভয় পাও ? জানো, ওকে যে কোনো মুহূর্তে আমি কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারি, দেশ থেকে বের করে দিতে পারি ! ও বেশ্যা, ওকে তুমি শক্তিশালী ভাবো ? মূর্খ বিজয় সিংকে হাত করেছে বলে ? আমি ওর কবল থেকে বিজয় সিংকে মুক্তি দিতে পারি। আমি বলতাম না বিজয় সিং মূর্খ ? তুমি ওকে আরও বিগড়াচ্ছো।

বিশ্বনাথ : হ্যাঁ, তা মানছি প্রভু—আমিই ওকে বিগড়েছি। কিন্তু এখন সময়ের চাপে আমাকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। রাজবাড়ি আর জাতির রক্ষক হিসেবে ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্টি করেছেন—তার জন্যে তো ত্যাগ করতেই হবে মহারাজ।

মান সিং : তোমায় খোলাখুলি বলছি বিশ্বনাথ, ঐ বেশ্যা তবুও কুমারকে ছাড়বে না। ওর মুঠো থেকে কুমারকে উদ্ধার করতে হবে। ভগবতীর কৃপায় আমার সে শক্তি আছে। এই বেশ্যাকে সোজা করে তবে অন্য কথা। ব্রজেশ্বরী এই মহল থেকে এক পাও নড়তে পারবে না। আর এই যদি নিয়তি হয় তা হলে আমারও চিন্তা নেই, আর ঐ বেশ্যাকে আমি রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষে করতে বাধ্য করাবো। (পাশের ঘরে পদধ্বনি) পাশের ঘরে কে ?

(বিজয় সিংয়ের প্রবেশ)

বিজয় সিং : আমি। আমি তোমার সমস্ত বাজে কথা শুনেছি। রাজেশ্বরী বেশ্যা নয়, তুমি নিজেই নির্লজ্জ—ঐ কিশোরী ব্রজেশ্বরীকে জালে বেঁধে রেখেছো। বৃদ্ধভাম। তুমি কি ভাবো ব্রজেশ্বরী

তোমাকে ভালবাসে ?

(বিশ্বনাথ কুমারকে চুপ করাতে এগিয়ে আসে, কিন্তু কুমার ওকে ধাক্কা দিয়ে অন্য দিকে ঠেলে দেয়। মহারাজ কোমর থেকে তলোয়ারটা খুলে সক্রোধে বলে)

মান সিং : ঐ বেশ্যা রাজেশ্বরী তোমাকে একেবারে বশ করে ফেলেছে ! যাও, চুপ করে বসো। আমি তোমাকে ভিখিরী আর ওকে বেশ্যা বানিয়েই ছাড়ব। বাবাকে গালাগাল দেওয়ার শাস্তি যদি তোমাকে দিতে না পারি তবে আমি রাজপুত নই।

বিজয় সিং : রাজেশ্বরী আমারই সঙ্গে রানী হবে, আমারই সঙ্গে হবে ভিখারিণী। কিন্তু ব্রজেশ্বরীকে যে হাওয়া ছুঁয়ে যায় সেটুকুও তোমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

(মন্ত্রী সভয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে)

মান সিং : (তলোয়ার বাগিয়ে এগিয়ে আসে) অসভ্য, বদমাস। দ্বারপাল !

(কুমারকে আক্রমণ করে। কুমারও ইতিমধ্যে নিজের তলোয়ার নিয়ে প্রস্তুত)

বিজয় সিং : (আহত) এই নাও বৃদ্ধভাম। তুমিও বহু সভ্যতা দেখিয়েছো।

(রাজার বুকে তলোয়ারের আঘাত করে। দুজনেই ধরাশায়ী হয়। পাশের ঘর থেকে দৌড়ে আসে রাজেশ্বরী)

বিশ্বনাথ : (রাজেশ্বরীকে) তুমিই নিয়তি, নিয়তি, ভবিষ্যৎ। তুমি আর তোমার মেয়ে—নিয়তির হাতের অস্ত্র।

রাজেশ্বরী : (বিষ পান করে) এই আমার যথেষ্ট। আর ব্রজেশ্বরীও এ ওষুধের খোঁজ জানে। ভগবতী ওকে রক্ষা করবেন। (ঢলে পড়ে)

(পর্দা নেমে আসে)

মৃতের র‍্যাশান

—গুরদয়াল সিং খোসলা

চরিত্রলিপি

(মঞ্চে প্রবেশের ক্রম অনুসারে)

দেবকী : নারায়ণ দাসের স্ত্রী

বিল্লু ও কৃষ্ণা : বাচ্চা

নারায়ণ দাস :

রাজ : নারায়ণ দাসের ভাই

দারোগা :

বুড়ো : নারায়ণ দাসের বাবা

(দশ ফুট × বারো ফুটের ছোট ঘর। চেহারা দেখেই বোঝা যায় গরীব লোকের ঘর। দুটো চারপাই (খাটিয়া), একটা চেয়ার, দু'তিনটে ট্রাঙ্ক, আলনায় কিছু ময়লা কাপড় এবং আরও অন্যান্য জিনিসপত্র দেখা যাচ্ছে। সামনের দেওয়ালের পেরেকে ঝুলছে লণ্ঠন—তার ধোঁয়ায় দেওয়ালে কালি পড়েছে। ঘরে দুটো রঙচঙে জিনিস আছে—একটা বাচ্চার দোলনা এবং দেওয়ালে লণ্ঠনের একটু দূরেই টাঙানো রঙীন একটা পাখা। সময় সকাল। বাঁদিকে বাইরে যাওয়ার রাস্তা, ডানদিকে ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি। দেবকী, ত্রিশের কাছাকাছি বয়সের এক মহিলা, আলনা থেকে ওড়না নিয়ে অগোছানো ভাবে গায়ে দেয়। হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙে। দেবকীর পরণে রঙীন কামিজ ও ময়লা সালোয়ার। চুল খোলা—যেন এখনি ঘুম থেকে উঠেছে। ছোট বাচ্চাকে তুলে আদর করে শুইয়ে দেয়। বাচ্চাটা একটু কাঁদে, আদুরে গলায় ওকে ঘুম পাড়ায়—'ঘুমো বাবা বিল্লু, ঘুমো, এখনও সকাল হয়নি' বলতে বলতে চাপড়াতে থাকে। বাচ্চা চুপ করে যায়। খালি খাট থেকে বিছানা পাট করে অন্য খাটে গিয়ে রাখে। খালি খাটটা নিয়ে বাঁদিকে এগিয়ে বাইরে যেতে গেলেই ওর স্বামী বাইরে থেকে এসে খাটিয়াটি ধরে নেয়)

নারায়ণ দাস : এত তাড়া কিসের ? কতবার তোমায় ভারী জিনিস তুলতে বারণ করেছি না।

দেবকী : ভার ওঠালে কি হবে ?

নারায়ণ : তোমাদের, মেয়েদের কি ভরসা করা যায় বলো ?

দেবকী : (আদুরে স্বরে) হুঁ:

নারায়ণ : (ঘটি গামছা ওর হাতে দিয়ে) নাও, ধরো।

(খাটিয়া বাইরে নিয়ে যায়। খালি জায়গাটায়, অর্থাৎ বহিষ্কৃত খাটিয়ার নীচে রান্নার জিনিসপত্র দেখা যায়—বাসন, টিনের কৌটো, ঝুড়ি ইত্যাদি। উনুনের ধারে দেওয়াল একদম কালো। দেবকী

গামছাটা আলনার একধারে ছুঁড়ে দেয়, ঘটিটা বাসনের সঙ্গে রাখে। উনুন থেকে ছাই নিয়ে থালায় ঢালে। নারায়ণ প্রবেশ করে। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। ছোট করে চুল ছাঁটা, মোটা গোঁফ। নোঙরা কামিজ ও কাপড় পরে বসে। খাটের একদিকে বসে সিগারেট ধরায়।)

দেবকী : (আলনার দিকে দেখিয়ে) গামছাটা তো বাইরে রেখে এলেই পারতে। ভিজিয়ে-টিজিয়ে ভেতরে এনে রেখেছ।

নারায়ণ : আমি এখন মাথাটি তেল দিয়ে ভালো করে মুছব।

দেবকী : আজকাল রোজই মাথায় তেল দিচ্ছ? চলবে কি করে?

নারায়ণ : না না, আজ দারোগা ডিপো দেখতে আসছে। আমার নতুন জামাকাপড় বার করে দাও তো। হ্যাঁ, শোনো, যখন ছেলেটাকে পাঠাবো, ওর হাতে দু'গেলাস চা পাঠিয়ে দিও। দারোগার সঙ্গে রোজই কাজ পড়ে, চা খেলে ওর মেজাজটা ভাল থাকবে।

(দেবকী ট্রাঙ্ক থেকে কাপড় বার করে। নারায়ণ কথা বলতে বলতে নোঙরা কামিজ ছেড়ে পরিষ্কারটা পরে নেয়।)

দেবকী : দারোগা কোনো সময়-টময় বলেনি? কখন আসবে কে জানে, তার জন্য আমি সারাদিন উনুন জ্বালিয়ে বসে থাকবো নাকি! ছেলেটাকে বলো মিষ্টির দোকান থেকে কেৎলীতে করে গরম জল নিয়ে আসতে, চা-পাতাটা আমি ভিজিয়ে দেব।

নারায়ণ : মিষ্টির দোকানে আবার জল পাওয়া যাবে কি না যাবে কে জানে? আর দারোগারও তাড়াহুড়ো থাকে। আমি বরং ছেলেটাকে বলব খেয়াল রাখতে। দূর থেকে ওকে দেখতে পেলেই ঘরে এসে যাবে। দু'পা দূরেই তো দোকান।

দেককী : আমার আর কি? আমি সারাদিন উনুন জ্বালিয়ে বসে থাবো। তারপর আবার বলতে এসো না কেন কাঠ শেষ হয়ে গেল, আর সন্ধ্যেবেলায় ফিরে কাপড় কাচা হয়েছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করতে পারবে না।

নারায়ণ : উহ্ হো। তুমি না হয় উনুন ধরিওই না। ঘণ্টাখানেক দেখে তারপর ধরিও। সামনের বছর জ্বালানীর ডিপো পেয়ে গেলে

এই ঝামেলাটা চোকে। দাও কেৎলী দাও, এখন জলটা মিষ্টির দোকান থেকেই নিয়ে আসি।

দেবকী : (বসে বসেই কেৎলীটা নিয়ে হাতে দেয়) নাও।

নারায়ণ : (কেৎলী নিয়ে) দাও। গেলাসও দাও, দুধটাও নিয়ে এসে রাখি।

দেবকী : একটু চিনিও এনো।

নারায়ণ : পরশু তো সেরখানেক চিনি পাঠালাম। শেষ করে ফেলেছে ?

দেবকী : বাচ্চাগুলো কি আর চিনি রাখতে দেয় ? এই জন্যেই তো একসঙ্গে বেশি চিনি রাখি না বাড়ীতে।

নারায়ণ : তাও তো নিজেদের র‍্যাশান দোকান আছে বলে চলে যাচ্ছে, যদি অন্যদের মত চিনি জোগাড় করতে হত তা হলে বোধহয় বিনা চিনির চা খেতে হত।

দেবকী : দেখবো কেমন বিনা চিনির চা খাও, (সিঁড়ির দিকে দেখিয়ে) তোমার বাবাই বা কেমন করে খান দেখতে হবে ? গেলাসে পুরো ছ'চামচ চিনি দিতে হয়।

নারায়ণ : তোমার রোজগারে তো আর খাচ্ছি না।

দেবকী ; যোগাড় তো আমাকেই করতে হয়। তোমাদের কথাও শুনতে হয় আমাকেই। কখনো যদি গেলাসে দুধ এতটুকু কম হয়, তোমার বাবার বাক্যিযন্ত্রণায় ঘুম ছুটে যায়। কৃষ্ণাকে স্কুলে ভর্তি করার পর থেকে রোজ তার নতুন খাতা চাই। তোমার ডাল একটু পাতলা হলে কথার চোটে ভূত নামাও। এক বিল্লু নেহাৎ কথা বলতে পারে না, নয় তো আমার হাড়কটাও আস্ত রাখতো না।

নারায়ণ : ওহ্ পাগলী, তোমার সব চিন্তা দূর করে দেব দেখো। দারোগার জন্যে ভালো করে চা করে পাঠিও। যদি আমার ডিপোতে একশোটা র‍্যাশান কার্ডও দেয় সব খরচ উসুল করে নেবো। দাও, দোকানের চাবিটা দাও তো দেখি।

দেবকী : তোমার সতেরো নম্বর ডিপোতে একশোটা র‍্যাশান কার্ড

হলে (বালিশের নীচে থেকে চাবির গোছা দেয়) আমাকে সোনার চুড়ি গড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু।

নারায়ণ : (চাবি সমেত হাতটা ধরে) নিশ্চয়ই। একশো কি বলছো, পঞ্চাশটাও যদি কার্ড দেয় আমার সতের নম্বর ডিপোতে তা হলেই তোমাকে চুড়ি দেব। সেদিন তো তোমাকে জাপানী পাখা কিনে দিলাম।

দেবকী : আহা, ভারী তো চার আনা দামের পাখা।

নারায়ণ : যেদিন অফিস থেকে অর্ডার বেরোবে সেদিনই তোমাকে গয়নার দোকানে নিয়ে যাব, পছন্দসই চুড়ি কিনে নিও।

দেবকী : (হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) না অর্ডার বেরোলে নেব না। হয়তো সরকারী অর্ডার আজ বেরোলো অন্য কেউ কাল ধরাধরি করে নিজের নামে করিয়ে নিল—সে হবে না। যেদিন একশোটা কার্ড তোমার ডিপোর আণ্ডারে আসবে সেদিন চুড়ি নেব।

নারায়ণ : আরে তুমি অত ভেবো না, আজই দারোগার সঙ্গে কথা বলব (পায়ে চেপে সিগারেট নেভায়।)

দেবকী : নাও, তাড়াতাড়ি যাও (সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করে) কর্তা বোধহয় এতক্ষণে চায়ের জন্যে চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছেন।

নারায়ণ : (বাইরে যেতে যেতে) আমার পায়জামায় দড়ি পরিয়ে রেখো।

(দেবকী পায়জামায় দড়ি পরিয়ে বাসন সাজিয়ে রাখে। উনুন থেকে ছাই বের করে বাইরে যায়। বছর সাতেক বয়সের কৃষ্ণা বিছানায় উঠে বসে।)

কৃষ্ণা : (ঘর খালি দেখে) মা!

দেবকী : (নেপথ্যে) আসছিরে কৃষ্ণা। (ভেতরে এসে) শুয়ে পড়—এখনও তোর ওঠার সময় হয় নি।

কৃষ্ণা : মা, ক্ষিদে পেয়েছে।

দেবকী : তোর বাবা দুধ আনতে গেছে, এক্ষুণি চা করে দিচ্ছি।

কৃষ্ণা : (জিদ করে) মা এখন একটু চিনি দাও।

দেবকী : হ্যাঁ, তোমরা শুধু শুধু চিনি খেয়ে শেষ করো আর তোমার বাবা আমার ওপর চটে যায় খালি।

কৃষ্ণা : উঁহুঁ!

দেবকী : (সিগারেটের কৌটা থেকে একটু চিনি দেয় ওকে) নে, খেয়ে মর। এক ঘণ্টার আগে উঠবি না। আমি ততক্ষণে হাতের কাজগুলো সেরে নিই।

(কৃষ্ণা চিনি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। দেবকী উনুনে কাঠ দেয়। আড়-মোড়া ভাঙে যেন খুব ক্লান্ত। উঠে ভিজে কাপড় দিয়ে চোখমুখ মুছতে থাকে। নারায়ণের প্রবেশ। তার এক হাতে কামিজের ধার দিয়ে ধরা কেৎলী, অন্য হাতে গেলাস।)

নারায়ণ : (মজা করে) কি মুখ পরিষ্কার হচ্ছে! ক্রিমপাউডারের ব্যবস্থাও হচ্ছে দাঁড়াও।

দেবকী : আহ্, সরো তো (উনুনের দিকে যায়)

নারায়ণ : (সামনে কেৎলী আর গেলাস রেখে ওর হাত ধরে টানে) আচ্ছা শোনো না।

দেবকী : (হাত ছাড়িয়ে) আহ্, সময় অসময় দেখবে তো? (চাপা স্বরে) কৃষ্ণা জেগে আছে। (চা তৈরী করতে থাকে।)

নারায়ণ : আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে।

দেবকী : এখনি বলছিলে দারোগা ডিপো দেখতে আসছে, ততক্ষণে তোমার খাতাপত্তরগুলো ঠিক করে নাও না বরং।

নারায়ণ : হ্যাঁ, ঠিক সময়ে মনে করিয়েছো।

(ট্রাঙ্কের উপর থেকে খাতা-কলম নিয়ে খাটের উপর দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে খাতায় লিখতে থাকে। দেবকী দু'টো পেতলের গেলাস ওড়না দিয়ে ধরে নারায়ণকে একটা দেয়, অন্যটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে যায়। নারায়ণ আঙুলে গুণে গুণে হিসেব করে। মুখ দেখে মনে হয় চিন্তিত, যেন হিসেব ঠিক মিলছে না।)

দেবকী : (তাড়াতাড়ি ফিরে এসে) বাবা তো এখনও ঘুম থেকেই ওঠেননি। দুয়েকবার ডাকলামও আমি। রোজ সকালে উঠে এতক্ষণে তো বাইরে থেকে ঘুরে আসেন। একটু দেখো না।

নারায়ণ : আহ্ কতবার বলেছি, হিসেবের মাঝে কথা বোলো না। সবে হিসেবটা মিলতে শুরু করেছিলো···

দেবকী : আরে ওপরে এদিকে তোমার বাবার হিসেব গড়বড় হয়ে যাচ্ছে যে। (নারায়ণ খাতা রেখে কলম কানে গুঁজে উপরে যায়। দেবকী কপাল চাপড়ে) উহ্, কাজের সময় সবাই সমান—। (উনুনের পাশে বসে চা তৈরী করতে থাকে। নারায়ণ একটু পরে প্রবেশ করে—খুব ঘাবড়ে গেছে।)

নারায়ণ : বাবার তো নাড়ী চলছে না।

দেবকী : সত্যি ?

নারায়ণ : হ্যাঁ, এসে দেখো।

(নারায়ণের পিছন পিছন দেবকী উপরে যায়। কৃষ্ণা বিছানা থেকে নেমে কৌটা থেকে একমুঠো চিনি নিয়ে খেয়ে আবার শোবার উপক্রম করতে থাকে। একটু পরেই দেবকী ফিরে এসে চা দেয়, বাসন এক-জায়গায় করে রাখে। উনুনে তাওয়া বসায়। নারায়ণের প্রবেশ। এসে দেবকীর পাশে বসে আর ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। দেবকী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকে। নিজের চোখ মোছে।)

নারায়ণ : (চেঁচিয়ে কাঁদে) বাবা, আমাদের ছেড়ে চলে গেলে, বাবা। (কৃষ্ণা বিছানায় উঠে নিজের বাবার দিকে আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে।)

কৃষ্ণা : মা ক্ষিদে পেয়েছে। (এসে নিজের বাবার পাশে বসে। নারায়ণ ওকে নিজের কোলে বসায়। ও মায়ের কাছে যায়। দেবকী চা দেয় ওকে। কৃষ্ণা চা খেতে খেতে বাবা-মাকে দেখতে থাকে।) মা, বাবা কাঁদছে কেন মা ?

নারায়ণ : তোর দাদু চলে গেলেন রে।

কৃষ্ণা : (মাকে) দাদু চলে গেল। আমিও যাব দাদুর সঙ্গে। (দৌড়ে যেতে গেলে দেবকী হাত ধরে থামায় ওকে।)

নারায়ণ : ওকে দেখে নিতে দাও।

দেবকী : একলা কি করে যাবে। (বোঝানোর স্বরে) কৃষ্ণা, তোর দাদু মারা গেছেন।

কৃষ্ণা : মরে গেছে। কিন্তু বাবা কাঁদছে কেন? দাদু তো নিজেই বলতেন ওঁর বয়স আশি পেরিয়ে গেছে, একদিন মারা যাবেন। (নীরবতা) আশি বছর বয়স হলে বাবাও মারা যাবে?

দেবকী : (উঠে কৃষ্ণাকে বাঁ দিকের দরজার কাছে নিয়ে যায়) তুই বাইরে গিয়ে খেলা কর।

কৃষ্ণা : মা, আমাকে মিষ্টি গুলি কিনে দাও না।

দেবকী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবো দেবো। (বাইরে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। নারায়ণকে বলে।) উঠে আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেবে তো।

নারায়ণ : রাজ এসে সব খবর দেবে। আমি বাবার কাছে বসতে যাচ্ছি।

দেবকী : রাজ কবে ফিরবে কে জানে? আট দিন হয়ে গেল বাড়ী ফেরেনি। (নীরবতা) শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার খরচটরচের কি হবে, বাড়ীতে তো একটা কানাকড়িও নেই।

নারায়ণ : আত্মীয়-স্বজনরা নিশ্চয়ই কিছু কিছু দেবে।

দেবকী : আত্মীয়রা শ্রাদ্ধের সময় দেবে, না শ্মশানযাত্রায় দেবে? (ধীর স্বরে) তুমি তো বড়ো, সবাই তোমার দিকেই দেখবে। রাজ অকম্মাকে কে পুছবে। সবাই জানে ও জুয়াড়ী। তুমিই একমাত্র রোজগেরে। বাবা অনেক সৌভাগ্য নিয়ে মারা গেছেন, কিন্তু এখন 'রেশমী কফন' না দিলে তো নাক কাটা যাবে আমাদের। রাজ আসবে ঠিক ভাগাভাগির সময়ে। এসে বলবে 'বাবার পাগড়ীর আর্ধেক আমার ভাগ।'

নারায়ণ : তুমি কি বলো?

দেবকী : আমার মনে হয় বাবার ক্যাশবাক্স খুলে দেখ কিছু যদি পাওয়া যায়। আর এখন যা খরচপত্তর হবে তা রাজ আসার আগেই বার করে রেখে দাও।

নারায়ণ : কত খরচ হবে এখন?

দেবকী : শ'খানেকের কম নয়। আমার বাবা মারা যাওয়ার সময় দুশোটাকা তো জলের মতো খরচ হয়েছিল।

নারায়ণ : তুমি ক্যাশবাক্সটা তো আনো।

(দেবকী উপরে যায়। নারায়ণ উঠে একটা নতুন কামিজ বের করে, সেটা রেখে আবার একটা পুরানো কামিজই পরে নেয়। দেবকী ক্যাশবাক্সটা নিয়ে আসে।)

দেবকী : (বাক্স মাটিতে রেখে) এই নাও চাবি।

নারায়ণ : এটা কোথায় পেলে ?

দেবকী : বাবার বালিশের নীচে ছিল। (নারায়ণ চাবিটা নিতে ইতস্তত করেও চাবিটা নেয়।) ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিই ? (বাঁ দিকে ছিটকানি তুলে দেয়। দুজনে বসে বাক্স খুলে সব বার করতে থাকে।)

নারায়ণ : এই তো টাকার থলেটা । (নোট গুণতে গুণতে) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত—এই হ'ল সত্তর টাকা।

দেবকী : অন্য কোণটাও দেখে নাও।

নারায়ণ : এদিকে ছটাকা (নোট আর খুচরো বের করে) আর এই হলো এগার আনা।

দেবকী : তার মানে ছিয়াত্তর টাকা এগারো আনা। এতে কাজ হয়ে যাবে না ? (একটা পুরিয়া খোলে) নথ, প্রায় আধতোলার মতো হবে।

নারায়ণ : (নথ নিয়ে আক্ষেপের স্বরে) বাবা মায়ের এই একটাই স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছিল। (একটা বই নেয়) বাবার গীতা। (পাতা উল্টে দেখে)।

দেবকী : দেখো, ছোট্ট খাতাটায় একটা পেন্সিলও রয়েছে। কৃষ্ণার হাতে পড়লে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।(খাটের উপর রাখে) এটা কি ? (একটা পুড়িয়া খোলে) লকেট ?

নারায়ণ : এটা ঠাকুমার।

দেবকী : (পরীক্ষা করে) সোনার পাত বসানো রয়েছে। হারটাও সোনারই মনে হচ্ছে। এক তোলা অন্তত সোনা হবে। মা এটা রাজের বৌয়ের জন্যে রেখেছিল। কিন্তু রাজের যা মতিগতি এটা আর ওর কাজে আসবে না। নাও, টাকাগুলো রাখো—সৎকারের খরচাতে সব লাগবে।

নারায়ণ : (পকেটে টাকা রেখে) বাকী কি করে হবে? নথটা মুদির কাছে বন্ধক রেখে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে আসি?

দেবকী : মুদীর কাছে বাঁধা রাখবে কেন? আমার কাছে বোনের একশো টাকা জমা আছে, তার থেকে পঞ্চাশ নিয়ে নথটা রেখে দি। পরে নথটা নিয়ে বোনের টাকাটা পুরো করে দেবে। (খাটের নীচে থেকে একটা ট্রাঙ্ক টেনে বার করে তাতে নথটা রেখে দিয়ে টাকা বের করে। নারায়ণ বাক্সটা খোলে।)

নারায়ণ : ডিবেটাতে আবার কি আছে? (ডিবে থেকে তাস বের করে ফাটায়) বাগানে বসে বন্ধুদের সঙ্গে বাবা তাস খেলত। (মৃদু হাসি) ডিবেটার উপর আবার লেখা লালা কৃপা রাম। কি একগাদা কাগজ জমা করেছে। (কাগজের বাণ্ডিল খোলে) বাবার কুষ্ঠী। (দেখে আবার রেখে দেয়।) কাকার চিঠি! এটা বাবার অ্যাঙ্গলো-ভার্নাকুলার পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট। ···র‍্যাশান কার্ড। (পরীক্ষা করে) গত মাসের কার্ড। এ দিয়ে আর র‍্যাশান তোলা যাবে না।

দেবকী : কাল রাত্তিরেই বাবা তোমাকে বলছিলেন সকালে র‍্যাশান কার্ডটা নিয়ে নিও।

নারায়ণ : আজ ওঁর র‍্যাশান তোলার দিন ছিলো।

দেবকী : মাত্র দু'ঘণ্টার তফাৎ, বয়ে গেল। দোকানে যাওয়ার সময় কার্ডটা নিয়ে যেতে পারতে, ছেলেটাকে দিয়ে র‍্যাশানটা পাঠিয়ে দিতে।

নারায়ণ : কথা তো তাই ছিলো, কিন্তু ভগবানের তা ইচ্ছা নয় যখন, কি আর করা যাবে।

দেবকী : কিন্তু এখুনি রাজ এসে পড়বে, পিসীও আসবে, অন্য আত্মীয়-স্বজনরাও হয় তো সন্ধ্যের মধ্যে এসে পড়বে। বাবার র‍্যাশানটা তোলা থাকলে আটা চিনির খানিকটা সুরাহা হত।

নারায়ণ : হ্যাঁ, সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছো। (চিন্তিত) এখন তো কেউ জানে না, বলো তো একদৌড়ে র‍্যাশানটা নিয়ে আসি।

দেবকী : হ্যাঁ তুমি যাও, আমিও বাক্সটা রেখে আসি। তাড়াতাড়ি করো, নয় তো রাজ আবার এসে পড়বে।

নারায়ণ : দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে নাও।

(নারায়ণ র‍্যাশান কার্ড, গামছা আর খুঁটিতে ঝোলানো থলি নিয়ে বেরিয়ে যায়। দেবকী ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে জিনিস গোছাতে শুরু করতেই বাচ্চা কেঁদে উঠে। উঠে বাচ্চাকে চাপড়ালে আরও জোরে কেঁদে উঠে বাচ্চাটা। বাচ্চাকে উঠিয়ে বুকের কাছে এনে দুধ খাওয়ানের ভঙ্গি করে। বাচ্চাকে কোলে নিয়েই জিনিস গোছাতে থাকলে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ জোর হতে থাকে। কোনো মতে জিনিসগুলো ভরে বাক্সটা খাটের নীচে ঠেলে দরজা খোলে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবক ঘরে ঢোকে—তার পাঁচ'ছ দিন ধরে দাড়ি কামানো হয় নি। উস্কোখুস্কো চুল। ছেঁড়া নোংরা কামিজ পরনে। খালি পা।)

দেবকী : (চুপ হয়ে যাওয়া বাচ্চাটাকে খাটে শোয়াতে শোয়াতে) অনেক দেরী করে এলে রাজ।

রাজ : বৌদি, পাঁচটা টাকা দাও না।

দেবকী : রাজ, বাবা মারা গেছেন।

রাজ : (ভাবলেশহীন ভাবে) কখন? (প্রসন্ন হয়ে) সত্যি? থাক তাহলে আর পাঁচ টাকা দিতে হবে না, আমি বাবার হাতবাক্স থেকে নিয়ে নিচ্ছি। (উপরে গমনোদ্যত)

দেবকী : (পথ আটকে) অমনি কোরো না রাজ, এখনও বাবার শরীরটা গরম রয়েছে। মড়ার টাকা চুরি করতে নেই।

রাজ : কিন্তু আমার টাকা চাই। আমার বাবা মরে গেছে, তোমার তাতে দুঃখ করার কি আছে? সরো রাস্তা দাও।

দেবকী : রাজ, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। এ পাপকাজ করো না। এই নাও, পাঁচটা টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নাও।

রাজ : (চিন্তিত) ঠিক আছে। টাকা নেয়। (নারায়ণের কাঁধে পুঁট্‌লী হাতে থলি নিয়ে প্রবেশ।)

নারায়ণ : রাজ!

রাজ : দাদা। (রাজ দৌড়ে এসে নারায়ণকে জড়িয়ে ধরে। ওর

হাত থেকে থলি পড়ে যায়। চিনি ছড়িয়ে পড়ে মেঝের উপর। রাজ এক মুঠো চিনি নিয়ে আবার ফেলে দেয়) দাদা, এটা কি ?
(নারায়ণের হাত থেকে র‍্যাশান কার্ড আর চাবি নিয়ে ছুজনের দিকে তাকাতে থাকে। র‍্যাশান কার্ডটা পড়ে।) লালা কৃপা রাম, বয়স ৭৮ বছর। (কার্ডটা ফিরিয়ে দেয়) বাবার র‍্যাশান। দাদা, এটা ঠিকই করেছ। (হাসতে হাসতে থলেটা উল্টে দিয়ে) বাহ্ আটা! (হাসতে হাসতে থলি পুঁটুলী একদিকে সরিয়ে বাচ্চাদের গা থেকে টান মেরে চাদরটা নিয়ে বগলদাবা করে ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে প্রস্থান।)

দেবকী : (খাটের নীচে থেকে বাক্সটা বের করে) প্রথমে এটাকে সামলাও।

নারায়ণ : এখনও গুছোওনি এটা ?

দেবকী : কি করে গুছাবো। তুমি যেতে না যেতেই বিল্লু কান্না জুড়ে দিলো। তারপরই রাজ এসে দরজা ঠেলতে শুরু করেছে। অতি-কষ্টে সব এক জায়গায় করে খাটের নীচে ঢুকিয়েছিলাম।

নারায়ণ : (বাক্সটা নিয়ে জিনিসগুলো গুছিয়ে ওটা বন্ধ করে। হঠাৎ মনে পড়ার স্বরে) ইস্, তুমিও খেয়াল করনি, রাজ, দোকানের চাবি নিয়ে গেছে।

দেবকী : হ্যাঁ, সঙ্গে চাদরও...

নারায়ণ : সব লুটেপুটে নিয়ে যাবে। আমি চল্লাম। (বাক্সটা তাড়াতাড়ি দেবকীর হাতে দেয়। দৌড়ে বাইরে যেতে গেলে বাইরে থেকে প্রবেশোদ্যত একজনের কাছে ধাক্কা খায়। লোকটি দারোগা। মাঝারি বয়েস। মাথায় খাকী পাগড়ি, হাতে ছড়ি। ওকে দেখেই দেবকী বাক্সটা খাটের নীচে লুকিয়ে ঘরে ছড়ানো চিনির ওপর কাপড় ঢাকা দেয়।)

দারোগা : ধীরে ভাই নারায়ণ দাস! (নারায়ণ হাত জোড় করে পিছনে সরে আসে।) কি ব্যাপার ?

নারায়ণ : নমস্কার দারোগা সাহেব। (সিঁড়ির দিকে দেখিয়ে) আজ সকালে বাবা মারা গেছেন।

দারোগা : মারা গেছেন? কিন্তু তুমি তো এমন দৌড়ঝাঁপ লাগিয়েছ যেন মনে হচ্ছে বাবার বিয়ে দিতে যাচ্ছ।

নারায়ণ : ন্না। এমন সময় মাথার আর কিছু ঠিক থাকে না।

দারোগা : আচ্ছা! সত্যিই খুব দুঃখের কথা। (ধীরে ধীরে) আমি বাইরে থেকে আওয়াজ দিলাম কিন্তু কোনও জবাব নেই। তাই ভাবলাম ভেতরে এসেই দেখি ব্যাপারটা কি? আজ অফিসে দরকারী কাজ আছে, তাই ভাবলাম যাওয়ার সময়ে বলে যাই যে আজ ডিপো দেখতে আসতে পারবো না।

নারায়ণ : ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের মতো গরীবদের কথা আপনি বড়ো মনে রাখেন দারোগাবাবু।

দারোগা : বড়ো দুঃখের কথা ভায়া, সত্যি দুঃখের কথা। অবশ্য ওঁর বয়সও তো হয়েছিলো অনেক।

নারায়ণ : হ্যাঁ, তা প্রায় আশি বছরের বেশীই হবে।

দারোগা : ও, তাহলে তো যথেষ্ট বয়সই হয়েছিল। অবশ্য বাবা মা বলে কথা! কি আর করবে, মনে জোর রাখো নারায়ণ। ঈশ্বর তোমায় জোর দিন। (নীরবতা) তা শ্মশানযাত্রা করাবে কখন।

নারায়ণ : আজ্ঞে, দুপুর পেরিয়ে যাবে মনে হয়। এখনো তো পাড়াপ্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনদের খবরই দেওয়া হয়নি।

দারোগা : ঠিক আছে। আজ আবার কাজের চাপ একটু বেশী। যদি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়, এসে পড়বো'খন। (নারায়ণ দারোগাকে নমস্কার করে। দারোগা প্রস্থানোদ্যত। রাজ মাথায় পুঁটলী করে জিনিস নিয়ে আসতে গিয়ে দারোগার সঙ্গে ধাক্কা খায়।) আহ্ সামলে। বাবা মরে যাওয়ায় যে খুব খুশী দেখছি, দৌড়ঝাঁপ করছ? কি এনেছ এটা।

রাজ : নমস্কার দারোগাবাবু। আজ্ঞে র‍্যাশান নিয়ে এলাম।

দারোগা : এই মণখানেক চিনি কোন কুম্ভকর্ণের র‍্যাশান।

রাজ : আজ্ঞে, চিনি সামান্যই আছে, বাকী আটা।

দারোগা : কিন্তু র‍্যাশানটা কার?

রাজ : বাবার...(এদিক-ওদিক তাকায়।)

দারোগা : বাবার র‍্যাশান। আমার মাথা ঠিক আছে না, তোমাদের দুজনের মাথার গণ্ডগোল ?

রাজ : আজ্ঞে বিয়ের সময় তো...

দারোগা : (বিরক্ত হয়ে) বাহ্, বাবার দাহ হলো না, এখন থেকেই বিয়ের চিন্তা ? ঠিক করে বলো, কি ব্যাপার ? নারায়ণ, তুমিই বলো ? (নারায়ণ চুপ করে থাকে।)

রাজ : আজ্ঞে, বলছিলাম কি কাল কাগজে দেখছিলাম বিয়ে আর শ্রাদ্ধের সময় আত্মীয়স্বজনের খাওয়া দাওয়ার জন্যে পঞ্চাশ জনের র‍্যাশান পাওয়া যায়, সেটাই এনেছি। এই দেখুন কার্ড। (নারায়ণ ওকে আটকাতে যায়। রাজ বুঝতে না পেরে সেটা দারোগার হাতে দেয়।)

দারোগা : (কার্ডটা পড়ে) লালা কৃপা রাম। বয়স আটাত্তর বছর। (কার্ডটা উল্টে পড়ে) কার্ডের মালিকের মৃত্যুর জন্য পঞ্চাশ জনের র‍্যাশান দেওয়া হলো। নারায়ণ দাস, ডিপো নম্বর ১৭। নারায়ণ এ র‍্যাশান তো তোমার ডিপো থেকে এসেছে। হ্যাঁ, আর সঙ্গে এ সপ্তাহর র‍্যাশানও নেওয়া হয়েছে। (চিন্তা করে) র‍্যাশানের সপ্তাহ আজ থেকে শুরু, আর তারিখও আজকেরই। সইটা অন্য কারো। এখনও তো র‍্যাশান ডিপো খোলার সময়ই হয়নি, তাহলে এটা কি ? সত্যি কথা বলো, তোমার বাবা মারা গেছেন, না বেঁচে আছেন এখনও ?

রাজ : (কাঁপা স্বরে) আজ্ঞে, আমি জানি না। আমি আজ আট দিন পর বাড়ী ফিরেছি, আজই সকালে। ঢুকতেই বৌদি বললো বাবা মারা গেছেন। (দারোগা মনোযোগ দিয়ে যখন নারায়ণ ও রাজের কথা শুনছে তখন দেবকী ছোট বাক্সটা খাটের নীচে থেকে বার করে দোপাট্টা দিয়ে ঢেকে লুকিয়ে উপরে নিয়ে যায়।)

নারায়ণ : আজ্ঞে, বাবা রাত্তিরে ঘুমের মধ্যেই মারা গেছেন, আপনি ইচ্ছে করলে উপরে গিয়ে দেখতে পারেন। ওঁর এ সপ্তাহের র‍্যাশান আমি কালই নিয়ে এসেছিলাম। তারিখ আজকেরই দিতে হয়েছে কেননা কালকের তারিখ তো আর নিয়ম অনুযায়ী দিতে পারি না।

দারোগা : হ্যাঁ, আজকের তারিখ তো দিতেই হবে, কিন্তু সপ্তাহ শুরু হবার আগেই র‍্যাশান নিয়ে নিয়েছো। এটা বেআইনী নয়? একটা অনিয়ম ঢাকতে আর একটা অনিয়ম করে যাচ্ছ?

নারায়ণ : ঘরে শোকের জন্যে আত্মীয়-স্বজনরা সব আসবে, তাদের ডাল-ভাতটা তো খাওয়াতে হবে। তাই বাবার র‍্যাশানটাও নিয়ে এসেছিলাম।

দারোগা : আহ্ কথাটা তো শোনো। তুমি গত কালই বুঝতে পেরেছিলে যে আজ বাবা মারা যাবেন। বাড়ীর ডিপো পেয়েছো না, যা প্রাণে চায় করে যাচ্ছ?

নারায়ণ : আজ্ঞে, দরকারের সময় একটু সাহায্য করা উচিত।

দারোগা : আর রাজ তুমি স্যাংশান বিনাই সরকারী ডিপো থেকে পঞ্চাশ জনের র‍্যাশান উঠিয়ে নিয়েছো। তা ছাড়া ডিপো হোল্ডারের জাল সই করেছো। খুব অন্যায় কাজ এসব। তোমাদের দুভায়ের এবার মজাটা বেরোবে।

নারায়ণ : (দারোগার পা জড়িয়ে) ক্ষমা করুন হুজুর, মৃত্যুশোকে মাথাটা ঠিক ছিলো না। পঞ্চায়েতে আমার অপমান হয়ে যাবে হুজুর।

দারোগা : (দয়া দেখিয়ে) ঠিক আছে, রাজ এই র‍্যাশান কার্ড নিয়ে চলো আমার সঙ্গে অফিসে, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

নারায়ণ : যা রাজ, তাড়াতাড়ি যা। সঙ্গে পুঁটলীটাও নিয়ে যা। দারোগা সাহেবের কথা মতো সব কাজ করবি। (রাজ পুঁটলীটা উঠায়) আপনার অনেক দয়া হুজুর, আমার বাবার লাশ নষ্ট হওয়া থেকে আপনি বাঁচালেন।

(সিঁড়ির কাছ থেকে দেবকীর চীৎকার শোনা যায়। দৌড়ে আসতে গিয়ে হাতবাক্সটা পড়ে যায়।)

দেবকী : (চীৎকার করে) বাবা গো—

(তখন আশি বছরের বুড়ো এক হাতে লাঠি অন্য হাতে গেলাস নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। বুড়োর সব জিনিস—চশমা, জামা, ধুতি ইত্যাদি নোঙরা ছেঁড়া খোঁড়া। খোঁচা খোঁচা দাড়ি

কানে কম শোনে, চোখেও দেখে কম। ওঁকে
দেখেই সবাই নিজের জায়গায় স্থির হয়ে
যায়। দেবকী উঠে বসে।)

বুড়ো : (ধীরে ধীরে নেমে বলে) বউমার চীৎকারটা শুনলাম। সব ঠিক আছে তো? (নীরবতা) কোথায় গেলে মা? (গেলাসটা বাড়িয়ে ধরে) ধরো, চাটা একটু গরম করে দাও তো। পড়ে পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। (সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেবকী উঠে গেলাসটা নেয়। বুড়ো এতক্ষণে সিঁড়ির প্রথম ধাপে এসে পৌঁছেছে।) আজ উঠতে একটু দেরী হয়ে গেল। ডাঃ সুরেশ সিং কাল যে ঘুমের ওষুধটা দিয়েছিল খুব কাজ দিয়েছে সেটা। গাঢ় ঘুম এসেছিল, খুব ঘুমিয়েছি। কিন্তু গায়ে বড় যন্ত্রণা, একটু গরম চা খেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। (শেষ সিঁড়িটায় নামতেই বাক্স থেকে পড়ে যাওয়া কোনো জিনিসে হোঁচট খায়।) এটা আবার কি?

(মাটিতে দেখে, নারায়ণ নীচু হয়ে ওটা তুলে নেয়। বুড়ো এক পা এগিয়ে যায়, অন্য জিনিসে হোঁচট খায়। কিন্তু নারায়ণ আবার চালাকী করে বাবার পা ধরে নেয়।)

নারায়ণ : বাবা, ওষুধ দেব, লাগেনি তো?

বুড়ো : না না, ঠিক আছে। (এগিয়ে আসে। বুড়ো বাক্সটার কাছাকাছি এসে গেলে নারায়ণ ও দেবকী রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে। নারায়ণের হঠাৎ খেয়াল হয়।)

নারায়ণ : রাজ বাবার চেয়ারটা দাও তো।

(রাজ যাওয়ার আগেই দেবকী চেয়ার এনে বাক্সটার উপর রেখে বুড়োকে বসিয়ে তার গা টিপতে থাকে।)

বুড়ো : গা টিপলে কি হবে? আমার চাটা গরম হলো না এখনো?

দেবকী : এক্ষুণি আনছি বাবা।

(দেবকী একটু ইতস্তত করে। গেলাসটা তুলে রাজের কানেকানে কিছু বলতেই রাজ গেলাসটা নিয়ে বেরিয়ে যায়।)

বুড়ো : (দারোগাকে দেখে) কে, দারোগাবাবু নাকি?

(নারায়ণ বুড়োর পিছনে দাঁড়িয়ে দারোগার দিকে ফিরে হাত জোড়

করে মিনতির ভঙ্গি করে।)

দারোগা : হ্যাঁ, লালাজী বলুন, শরীর কেমন?

বুড়ো : (ওঠার চেষ্টা করে) আপনি দাঁড়িয়ে কেন, আসুন, বসুন। (নারায়ণ সাহায্য করে।)

দারোগা : না না, আপনি বসুন, আমি এখানে বসছি। (খাটিয়ার একধারে বসে।)

বুড়ো : শরীরে এখন তো আর তেমন জোর নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেটুকু আছে এটাই ভরসা আর কি। ঠিক করে ঘুমও হচ্ছিল না। কাল আমি ডাঃ সুরেশ সিং-এর কাছে গিয়েছিলাম—ঐ যার দোকান নারায়ণের ডিপোর কাছে। (দেবকী চুপিচুপি চেয়ারের নীচে থেকে বাক্সটা বের করে তাতে জিনিস-পত্তর ভরতে থাকে।) আমি বল্লাম, ডাক্তারবাবু, ঘুম হয় না। তা উনি একটা ওষুধ দিলেন। বল্লেন, যদি একদম ঘুম না হয়, তা হলে এক চামচ খেয়ে নেবেন। কাল রাতে আশেপাশে কারো বিয়ে ছিল—মাঝ রাত্তির পর্যন্ত তো তার চেঁচামিচি চলল। ওষুধ খেলেও ওর মধ্যে ঘুমোনো অসম্ভব। মাঝ রাত্তিরের পর এক চামচ খেলাম—কেননা ডাক্তার বলেছিল একেবারে যদি ঘুম না আসে তবেই খেতে।

(বাক্সের কোনো একটা জিমিস বুড়ো দেখতে পায়। দেবকী সেটা দেখিয়ে নারায়ণের জামা ধরে টান দেয়। নারায়ণ সেটা উঠিয়ে ওর হাতে দেয়।)

বুড়ো : কি ওটা?

নারায়ণ : কিছু না, কাপড় পড়ে ছিল।

বুড়ো : বুঝলেন দারোগাবাবু, যে ডাক্তারের ওষুধ খাওয়া হয়, তার কথামতো চলা উচিত। নয় তো ওষুধের কাজ হয় না। তাই তো ওষুধ খেয়ে এত গাঢ় ঘুম হলো যে অন্যদিনের থেকে অনেক দেরী পর্যন্ত ঘুমালাম। নারায়ণের বৌ রোজ সকালে আমার মাথার কাছে চায়ের গেলাস রেখে আসে, আজও এসেছে। দোষ তো আমারই, ও বেচারীর আর কি দোষ। (একটু হাসে। দেবকী বাক্সটা উঠিয়ে আনে।) কি হলো বৌমা, চা এখনও গরম হলো না? (উনুনের দিকে

দেখে) দেবকী তো এখানে নেই, উনুনেও আঁচ দেওয়া নেই। বৌমা কোথায় গেল নারায়ণ?

নারায়ণ : (ঘাবড়ে গিয়ে) এখানেই কোথাও আছে, আশেপাশে।

বুড়ো : আজ আঁচ দেয়নি?

নারায়ণ : উনুন জ্বালিয়ে তো ছিল, দেবকী নিভিয়ে দিয়েছে। আপনার ঘুম থেকে উঠতেও দেরী হয়েছে, তা ছাড়া আজকালকার জ্বালানীগুলো বেশীক্ষণ জ্বলেও না।

বুড়ো : এতো তো দেরী হয়নি? ক'টা বেজেছে দারোগা সাহেব?

দারোগা : (পকেট থেকে ঘড়ি বের করে) সময়...আমার ঘড়িতে তো এখন সাড়ে ছটা। (নারায়ণ হাত জোড় করে দারোগাকে মিনতি করতে থাকে।) আমার ঘড়িটা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছিল।

বুড়ো : কি বলছেন দারোগাবাবু?

দারোগা : আমারঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বুড়ো : নীচে এসে রাজকে দেখলাম মনে হলো।

নারায়ণ : হ্যাঁ, রাজই। এখনই এসে পড়বে।

বুড়ো : তুমি আজ দোকান খুলবে না?

নারায়ণ : খুলবো বাবা।

বুড়ো : (তাড়া দিয়ে) তা হলে আমার গা টিপছ কেন। আগে তো কখনো করোনি। (বিশ্রাম) কি হলো? গায়ে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু চা এলো না এখনো? (দেবকী সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কথা শুনেই থেমে যায়।) রাজকে এখানেই দেখলাম, কোথায় আবার লুকোলো। তুমি আমার মাথার কাছে এমন করে দাঁড়িয়ে আছ যেন কাজকর্ম্ম সব জলাঞ্জলি দিয়েছ? দারোগা সাহেবের ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে, উনুনে আঁচ দেওয়া হয়নি। (উঠে দাঁড়ায়।) বলো, কি ব্যাপার। (সবার দিকে তাকায়। দুয়েক পা হেঁটে মঞ্চের মাঝে এসে দাঁড়ায়। কেউ নড়ে না।) আজ কি কেউ মরে-টরে গেছে নাকি?

(সবাই পাথরের মতো নিস্তব্ধ। কৃষ্ণা বাইরে থেকে দৌড়ে এসে বুড়োর পা জড়িয়ে ধরে। বুড়ো ওর পিঠে হাত বোলাতে থাকে।)

কৃষ্ণা : (পিছনে সরে এসে) দাদু, তুমি তো মরে গেছিলে। মরে গিয়ে লোকে যেখানে যায় সেখানকার গল্প বলো আমায়।

(বুড়ো চেয়ারটা ধরে নেয়, পড়ে যেতে থাকে। নারায়ণ, দেবকী ও দারোগা ওকে ধরার জন্য এগিয়ে আসে।)

(যবনিকা)

মনে রয়ে গেল

—হরচরণ সিং

চরিত্রলিপি

শেরু ঃ
করমী ঃ
নম্বরদার ঃ
অন্ধো ঃ
করম সিং ঃ
রাজা

[এক গাঁয়ের মাঝামাঝি একটি ভাঙাচোরা বাড়ী, তার সামনের দরজাটা পূর্ব দিকে একটা নোঙরা গলির উপর। অঙ্গনে একটা নিম-গাছ। গাছের নীচে সুন্দরী একটি মেয়ে। অম্বো। বয়স তিরিশ বছর। পিঁড়িতে বসে কাজল পরছে। তাকে বেশ খুশী দেখালেও মাঝেমাঝেই তার মুখে দুঃখের ছাপ পড়ছে। আয়না তুলে মুখ দেখলেই খুশী হয়ে উঠেছে মুখ। দরজায় শব্দ হতেই তাড়াতাড়ি আয়না আর সুরমাদানী পিঁড়ির নীচে লুকিয়ে ফেলে দরজা, খোলার জন্যে ওঠে।]

নেপথ্য কণ্ঠস্বর : অম্বো, অম্বো, হলো তোমার।

অম্বো : হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়ে গেছে।

(শেরুর প্রবেশ। বছর তিরিশেক বয়সের স্বাস্থ্যবান যুবক। যার গলায় কণ্ঠি, পরনে লুঙ্গি, এবং সুন্দর পাগড়ী। মুখে আর গোঁফে আতরের প্রসাধন।)

শেরু : (গোঁফে তা দিতে দিতে) বাঃ, কি সুন্দর!

অম্বো : এসো, ভেতরে এসো, দরজায় দাঁড়িয়ে কেন ?

শেরু : (হাসি-হাসি মুখে) ভাবলাম হয় তো চিনতেই পারনি।

অম্বো : আহা, তোমায় চিনবো না তো কাকে চিনবো ?

শেরু : তা হলে ঘোমটা টানছ কেন ? ঘরের লোকের নজর লাগে না। ঘোমটাটা খোলই না, আমিও একটু দেখি।

অম্বো : (ঘোমটা খুলে সহাস্যে) আজ তোমাকে দেখে ভীষণ লজ্জা করছে।

শেরু : (একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে) অম্বো, আমার দিকে তাকাও।

অম্বো : বলো না, কি বলবে ?

শেরু : ভাবছিলাম ভয়টা ঘুচিয়ে নিই, কে জানে হয় তো আর কেউ হবে। বিশ্বাস করো, আজ একেবারে অন্যরকম লাগছে, ঠিক যেন বর্ষার পর নয়নাদেবীর মন্দির।

অম্বো : ধ্যাৎ।

শেরু : আমি তো ভাবছিলাম স্বর্গ থেকে কোনো পরী নেমে এলো নাকি ?

অম্বো : আহ্, চুপ করো তো, আর লজ্জা দিতে হবে না।

শেরু : সত্যি, আজ প্রথম তোমাকে এত খুশী দেখলাম।

অম্বো : তোমায় দেখে আজ আমার কে জানে কি হয়ে গেছে। চোদ্দ বছরের সব দুঃখ এক নিমেষেই বদলে গেল।

শেরু : অম্বো, তুমি এখনও পর্যন্ত কিই বা দেখেছ। তুমি তো একটা পাগলী, নরকের মধ্যে এখনও পড়ে আছ।

অম্বো : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) মিথ্যে বলনি, নবক, সত্যিই নরক।

শেরু : তোমার ঝুমকো, চুড়ি, গয়নাগাঁটি ,কাপড়-টাপড় সব ঠিক হয়েছে তো ?

অম্বো : যা এনেছো, সব একদম ঠিক আছে।

শেরু : কোনো কিছু কম নেই তো ? আচ্ছা শোনো, ঘড়ি-চেনটা কি বলো তো ?

অম্বো : তুমি এ নাম কোথায় শুনলে ?

শেরু : কাল যখন শহবে যাচ্ছিলাম আমার টাঙ্গায় দুটো বউ বসে ছিল। একজন বলছিল আমি আমার বৌমার ঘড়ি-চেন বানিয়ে দিয়েছি। স্যাকরার খুব প্রশংসা করছিল।

অম্বো : (সহাস্যে) এটা একরকম গয়না। কব্জিতে পরে কিন্তু বানাতে অনেক খরচ।

শেরু : খরচেব কথা তোমায় চিন্তা করতে হবে না। যদি জমি বাঁধা দিতে হয় তাও রাজী—তোমার ঘড়ি-চেন তৈরী করে দেবই দেখে নিও।

অম্বো : আমার আর কিছু দরকার নেই, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি সমস্ত কিছুই পেয়েছি।

শেরু : আরে এই তো জীবন। খাওয়া-পরা—এই নিয়েই তো দুনিয়া। শরীর সুখী আর মন খুশী রাখতে জানো তো ?

অম্বো : (পিঁড়িটা সরিয়ে) আচ্ছা বোসো তো একটু।

শেরু : বসবো নতুন কুয়োর ধারে, বড় গাছের ছায়ায়। তুমি রুটী নিয়ে আসবে, আমি ক্ষেতে কাজ করবো।

অম্বো : (দীর্ঘশ্বাস নিয়ে) যেখানে বসে আমি গান শুনতাম।

শেরু : পুরানো কথা ছাড়। এবার তুমি ঐ সব ক্ষেতে রানী হবে, রানী।

অম্বো : আর তুমি রাজা।

শেরু : তোমাকে নিয়েই তো আমার রাজ্য। আমার কি মনে হয় জানো, মনে হয় কাজ যাই করো বউ না থাকলে চলে না।

অম্বো : (সহাস্যে ওর হাত ধরে) সত্যি বলছ, না আমার মন রাখার জন্যে বলছ?

শেরু : জানো অম্বো ছোটবেলা থেকে আমার একটা সাধ ছিল।

অম্বো : কি সাধ?

শেরু : এই সাথী যদি হয় তবে মনের মতন হোক, নয় তো নাই বা হল। এ কথাটা বোধহয় শুনেছো।

অম্বো : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) কিন্তু মেয়েদের মনের কথা তো মনেই রয়ে যায়। বাপ-মা যার সাথে খুশী জোড় বেঁধে দেয়।

শেরু : যাই হোক ভগবান তোমাকে আমার সাথী বানিয়েছেন। নিতান্ত ভাগ্যই বলতে হবে যে সে সব সত্যি হল না। তবু ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

অম্বো : (সাশ্রু নয়নে) সত্যি বিশ্বাস করো, আমার বাবা-মার উপর ভীষণ রাগ হয়—আমাকে একটা মোদোমাতালের গলায় ঝুলিয়ে দিল।

শেরু : (সান্ত্বনা দিয়ে) সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখো না উপরের ঘরটা তৈরী হয়ে এলো বলে—

অম্বো : ভয় হয়, আবার সব ভেঙেচুরে নালীতে না পড়ে।

শেরু : তুমি একটা পাগলী। (উপরে তাকিয়ে) দেখো, যেমন নিমের ডালে নতুন পাতা এসেছে, তোমারও তেমনি নতুন করে জীবন শুরু হবে এবার।

অম্বো : (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) এতো প্রত্যেক বছরই ফোটে, কিন্তু

আমার আশার ফুল গত চোদ্দ বছরে একবারও ফোটেনি।

শেরু : দেখো, এবার ভগবানের ইচ্ছেয় প্রত্যেক বছর ওরাও ফুটবে। (দু'জনেই হাসে)

অম্বো : আজ তোমাকে সেদিনের মতনই খুশী লাগছে।

শেরু : কোন দিনের মতো ? বলো, আমার দিব্যি। যদি না বলো তো—

অম্বো : সেই মেলার দিনের মতো! তুমি কুয়ো থেকে তুলে জল খাওয়াচ্ছিলে, আমি জল ভরতে গিয়েছিলাম।

শেরু : বিশ্বাস করো, সেদিন থেকে তোমার কথা ভাবতে শুরু করেছি। তুমি তো ঘড়া উঠিয়ে চলে এলে, আর তোমার অবস্থা দেখে আমার ওদিকে কান্না এসে গিয়েছিল। সেদিন মনটা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিলো যে মেলাতে আর যাওয়াই হলো না।

অম্বো : (আশ্চর্য) সত্যি ?

শেরু : সেদিন থেকে মনে মনে শপথ করেছি যাই হয়ে থাক অম্বোর দুঃখ দূর করতে হবে। সবকিছু ছেড়ে দিলাম। নিজে মাথা নীচু করে সবার কাছে মিনতি করেছি, খোশামদ করেছি। শেষে বহু কষ্টে গ্রামের পঞ্চায়েৎ ডাকার ব্যবস্থা হল।

অম্বো : (ভাববিভোর) আমার জন্যে তোমার কত কষ্ট করতে হল!

শেরু : এ দুঃখের আনন্দটা যে কি, তা আমিই বুঝি। নেশার মতো—প্রথম মদ খাওয়া নেশার মতো ঘোর।

নেপথ্য স্বর : চৌধুরী সাহেব।

শেরু : কে রাজা নাকি, রাজা ?

রাজা : (নেপথ্যে) সারা গ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেললাম আপনাকে।

শেরু : হ্যাঁ ভাই, আর কতো দেরী ?

রাজা : আপনারই অপেক্ষা করছে সবাই, সকলেই এসে বসে আছে।

শেরু : ঠিক আছে যাও, আমি এখনি আসছি। (অম্বো) তুমি

ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন ?

অম্বো : ও দরজা ধাক্কা দিতেই আমার বুকের ভেতরটা কাঁপতে শুরু করেছে, ভেবেছিলাম ননদ এসেছে বুঝি। এখনো ধক্‌ধক্‌ করছে বুকের ভিতর।

শেরু : এলেই বা, ওকে ভয়ের কি আছে ?

অম্বো : তুমি জানো না, ও একটি মূর্তিমতী আপদ।

শেরু : মিয়া-বিবি রাজী থাকলে কাজী করবে কি ? এখন আর কিচ্ছু হবে না। সে যেই আসুক না কেন।

অম্বো : আমার কাপড়-চোপড় ঘরে পৌঁছে দাও, সত্যি সত্যিই আবার না এসে পড়ে।

শেরু : আমি এখান থেকে কিছু নিয়ে যাব না। কিছু ভেবো না তুমি। জিনিসে ঘর একেবারে ভরে দেব। (প্রস্থানোদ্যত) তৈরী হয়ে এসো তাড়াতাড়ি। (প্রস্থান)

অম্বো : আমি এখানে কি করবো। শুধু একটা ঘাঘরা পরতে হবে।

(অম্বো বারান্দায় চলে যায়। তখনই সবেগে প্রবেশ করে এক মহিলা—চেহারা দেখে মনে হয় ঘাবড়ে গেছে।)

করমো : (এদিকে ওদিকে দেখে) বৌদি, অমর বৌদি।

(অম্বো ঘাঘরা হাতে নিয়ে বাইরে আসে। করমোকে সামনে দেখে যেন কেঁপে উঠে।)

অম্বো : একি তুমি এখানে।

করমো : বৌদি বলবো কি। রাত্তিরে একটা উড়ো খবর শুনলাম —সত্যি মিথ্যে জানি না। আমার তো গলা দিয়ে খাবার নামছে না।

অম্বো : (নির্ভয়ে) মিথ্যে হবে কেন, কথাটা সত্যি।

করমো : কি, কি বলছো তুমি ?

অম্বো : পঞ্চায়েতে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, যারা এ সব করিয়েছে।

করমো : আমাকে তো বলতে পার কিসের দুঃখটা তোমার।

অম্বো : তুমি আমার মতো বিধবা হলে বুঝতে আমার দুঃখটা কিসের।

করমো : (উরুতে হাত চাপরায়) তোমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে, একি সর্বনেশে কথা। আমার দাদা বেঁচে রয়েছে, তুমি তাকে মেরে ফেল্লে ?

অম্বো : যে লোকটা বারো বছর বাড়ীর বাইরে, কোনো দিন কোনো খবর দিলো না. একটা চিঠি-পত্তর নেই, এক কানাকড়িও পাঠায় নি কোনো দিন—আমার কাছে সে মরা লোক ছাড়া আর কিছু নয়।

করমো : তুমি তো নিজের রোজগারে ভালোই ছিলে, কি দুঃখ ছিল তোমার ?

অম্বো : আমার বাবার তো জমিদারী নেই যার জোরে সারাজীবন পেট চলবে। আমিই জানি কি করে পেট চলেছে। আজ তুমি নিজের ভাইয়ের অধিকার ফলাতে এসেছ। কিন্তু সেদিন কোথায় ছিলে যখন লোকের বাড়ীর বাটনা বেটে, গোবর লেপে দিন কাটাতে হয়েছে।

করমো : (ঘরে উঁকি মেরে) ঘরে জিনিস-পত্তরই বা সব কোথায় উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে ?

অম্বো : ঘরে ছিলই বা কি ? সব উনুনের ছাই। যেটুকু ছিল তাও মদের জন্যে সব উড়িয়ে দিয়েছে, শেষ করেছে সব।

করমো : দেখো, দেশের অবস্থা দিনে দিনে কি হ'ল। আগেকার দিনে মেয়েরা স্বামীর আশায় সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতো।

অম্বো : আমিই বা কি কম করেছি ? এক-একটা করে দিন গুনে গুনে বারোটা বছর কাটিয়ে দিয়েছি। মুখে বলাটা খুব সোজা, সময় কাটাতে গেলে তবে টের পাওয়া যায়।

রাজা : (নেপথ্যে) বৌদি, অনেক দেরী হয়ে গেছে, সবাই তোমার জন্যে বসে রয়েছে ওদিকে।

অম্বো : তুমি যাও, আমি আসছি। (ঘাঘরা হাতে নিতে নিতে) থাক্‌গে ঘাঘরাটা। বার বার নাপিত আসছে, লোকে কি ভাবছে কে জানে।

করমো : (নম্র স্বরে) বৌদি, আমার কথা শোনো। এতোগুলো

দিন যখন কাটালে তখন আর কয়েকটা মাস না হয় অপেক্ষা করো না? ভেবে দেখো।

অম্বো : ভেবে দেখার আর কিছু নেই। এই অপেক্ষা করে করে আমার সোনার মতো যৌবনটা গলিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিলাম। আর তাছাড়া ও ফিরে এলে আমায় কি এমন সিংহাসনে বসাবে। আবার তো সেই মারপিটই শুরু হবে।

করমো : তোমার চালাচালন প্রথম থেকেই সুবিধের ঠেকছিল না। আজ তাই এসব কথা নতুন লাগছে না।

অম্বো : তেমন হলে এ নরকে চৌদ্দ বছর পড়ে থাকতাম না, কবেই মুখে কালি মেখে বেড়িয়ে পড়তাম।

করমো : (হতাশ হয়ে মারতে থাকে) বৌদি, তোমার নরকেও জায়গা হবে না দেখে নিও। ছিঃ ছিঃ, কি ভাবে তুমি সবার সঙ্গে মিলে আমাদের মুখে চুন-কালি মাখাচ্ছ? আমি ঐ নোঙরা জঘন্য পঞ্চায়েতের সামনে গিয়ে তোমায় ঝাঁটা-পেটা করব। দেখবো কি করে ওরা বিচ্ছেদ মঞ্জুর করে। (চলতে থাকে)

নম্বরদার : (সক্রোধে) মুন্নী, কি করছ এখনো, সারা গ্রাম ওদিকে অপেক্ষা করছে।

অম্বো : জ্যেঠামশাই, বোন যে যেতে দিচ্ছে না, কি করবো?

করমো : (চীৎকার করে) বৌদি, সারা পৃথিবীতে কোথাও তোমার জায়গা হবে না, তুমি আমাদের নাক কাটাতে চলেছ।

নম্বরদার : শোনো মা, পাগলামী কোরো না, ঘাঘড়া ছেড়ে দাও। চেঁচামিচি করে কি লাভ?

করমো : জ্যেঠামশাই, এ নিজেই ছিল অসভ্য, বদমাশ। আমাদের কথা তো একবারও ভাবলো না।

নম্বরদার : কি বলছ তুমি! এর মতো ভালো মেয়ে সারা পৃথিবীতে নেই। ও যেভাবে দিন কাটিয়েছে কজন তা কাটায়? ছেলেটা একবার এর কথা ভাবল না, একদিনের জন্যেও না—এদিকে এ বেচারী মরতে বসেছে।

করমো : কতদিন হয়ে গেল। যখন ফিরে আসবে দাদা, তখন

ঘরবার সব ভরে দেবে। কি ভাবেন আপনি দাদাকে ?

নম্বরদার : আমি ঐ অকম্মাটাকে ভালো করেই চিনি।

শেরু : কি হ'ল তোমার, কতবার নাপিতকে পাঠালাম। (নম্বরদারকে দেখে) জ্যেঠামশাইকেও কষ্ট করতে হ'ল।

নম্বরদার : কি করবে বেচারী, করমো ওকে আটকে রেখেছে।

শেরু : করমো ওকে আটকাবার কে।

নম্বরদার : তুমি চুপ করো তো বাছা, আমি দেখছি সব।

করমো : ছাড়ো ছাড়ো, নিজের মা-বোনরে চোখ রাঙিও। আমাকে কিছু বললে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

নম্বরদার : চুপ করো মা, তোমায় কিছু বলেনি।

শেরু : তাহলে যাচ্ছ না কেন, দেরী কিসের ?

নম্বরদার : তাড়াহুড়োর কিছু নেই, যাচ্ছে যাচ্ছে। আমি ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। করমো, একটু সরে দাঁড়াও তো, বৌ-মাকে যেতে দাও।

(দরজায় কারো কাশির শব্দ। সবাই সেদিকে দেখে। একজন রুগ্ন চেহারার লোকের প্রবেশ।)

করম সিং : (সবায়ের উদ্দেশ্যে) বাহ্‌বা বেশ। নম্বরদারজী ভালো তো ?

নম্বরদার : আরে করম ?

করম : আজই আসছি আমি। করমী, ভাল আছিস তো বোন ? আরে চুপ কর, কাঁদে না পাগলী।

করমো : (গলা জড়িয়ে) ভাগ্যবান দাদা, তুমি এসে গেছ। কিন্তু তুমি তো খবর দাওনি কিছু। অপেক্ষা করতে করতে একেবারে আজকের দিনটা এসে পড়ল।

করম : আমিও ভাবছিলাম আসব না, কিন্তু দিন দিন অসুখটা বেড়েই চলেছে।

নম্বরদার : তুমি তো আশ্চর্য হে। কতদিন হলো এখান থেকে গেছ, খবরাখবর কিছু নেই।

করম : নম্বরদারজী, তুমি তো জানো আমায়। বদলে যাইনি

আমি। (কাশি)

করমো : দাদা কি হয়েছে ?

নম্বরদার : হাঁপানি। নেশাভাঙের অভ্যেস বোধহয় যায়নি এখনো ?

করম : সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পাল্টে গেলেও আমার দশা এমনই থাকবে।

করমো : দাদা, জিনিস-পত্তর পিছনের টাঙায় আসছে নাকি ?

করম : (সহাস্যে) আমার সঙ্গে জিনিস কিসের। পরনের এই কাপড় দুটো ছাড়া আর কিছুই নেই আমার।

নম্বরদার : যেমন গিয়েছিল তেমনিই ফিরে এসেছে।

করমো : (সক্ষোভে) চলো, দাদা এসেছে, সব এসে গেছে।

(স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শেরু আর অম্বো একে অন্যের দিকে তাকায়। অম্বো ভিতরে চলে যায়, শেরু বেরিয়ে যায় বাইরে।)

করম : বলো নম্বরদারজী, গ্রামের খবর কি ? নতুন খবর শোনাও।

নম্বরদার : সব ঠিক আছে। (সামলে নিয়ে) করমো, দাদাকে জল-টল দাও। পরে কথাবার্তা বোলো।

করম : তুই কখন এলি করমো ?

করমো : আজি এখুনি এসে দাঁড়িয়েছি, জুতোটা পর্যন্ত ছাড়া হয়নি।

করম : ভালোই হয়েছে এসে পড়েছিস।

করমো : দাদা পিঁড়িতে বোসো। বৌদি বাইরে এসো একটু। খুশীর দিনে জল-টল খাওয়াও অন্তত।

করম : বৌদি ? অমর ? বেঁচে আছে এখনো ? আমি তো ভেবে-ছিলাম মরে ভূত হয়ে গেছে।

করমো : (দরজার ভিতরে উঁকি মেরে) দাদা শীগগীর এসো।

করম : (দেখে) আমার জন্যে ও এতো সুন্দর একটা কাপড় পরে ছিল।

করমো : না দাদা, ধরো, ওর মুখে একটু জল দিতে দাও।

করম : কি দুর্ভাগ্য, আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

(করম সিং তাকে দেখে কেঁপে উঠে। পুরাণো দিনের স্মৃতি ভেসে উঠে

চোখে। দোষীর মতো ও অম্বোর দিকে তাকিয়ে ভয়চকিত হয়ে যায়। করমো মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে থাকে।)

(যবনিকা)

ঘাটের নৌকা

—বলবন্ত গার্গী

চরিত্র-লিপি

স্থরজিৎ : মাঝি

দীপো : স্ত্রী

লাজো : বোন

সুন্দর : বন্ধু

পিসী

[নদীর পাড়ে কুঁড়েঘর। দড়ি, নৌকা ইত্যাদি মাছ ধরার জিনিস পড়ে রয়েছে। মঞ্চের উপর পিছনের দিকে ছোট খাটিয়াতে রুগ্না পিসী। দীপো আর লাজো বসে কথা বলছে। দীপো উনুনে ফুঁ দিয়ে উনুন ধরাবার চেষ্টায় ব্যস্ত।]

লাজো : দীপো!

দীপো : হ্যাঁ?

লাজো : পিসী তো কাশির চোটে মরোমরো। খুব বেড়েছে—দম নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। পথ্যিটা এখনও সিদ্ধ হলো না।

দীপো : এইভাবে ফুঁ দিয়ে তো মারা যাচ্ছি কিন্তু আজ তো আগুন আগের মতো জ্বলছে না। এখন পর্যন্ত ভালো ওষুধ হলো না।

লাজো : দুদিন ধরে তো এই খাওয়াচ্ছ, কিন্তু সুরাহা হলো না, সেইরকম দম বন্ধ হয়ে আসছে। বদ্যির কাছ থেকে সেই কাশির ওষুধটা নিয়ে এসো বরং, যেটা গতবারে দিয়েছিল।

দীপো : রাত বেশ হলো, বর্ষাও খুব, দেখ না নদীতে কি জল বেড়েছে। একা যাব কি করে?

লাজো : পাঠাবোই বা কাকে—ঘরেও কেউ নেই।

দীপো : কিন্তু আমি কি করে যাব?

লাজো : পথ্যি খাইয়ে বুকে ভালো করে মালিশ করে দাও। হয় তো কিছুটা আরাম হবে। আমি দেখি কাউকে পাই কি না। (বাইরে ঝুঁকে) ওমা! কি জল বেড়েছে রে। ঢেউ তো আমাদের কুঁড়ে পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে। তুমি নৌকাটা টেনে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলে তো?

দীপো : হ্যাঁ ঠিক করে বাঁধা আছে, কিছু হবে না।

(গান শোনা যায়)

এবারে পার করে দে না
চলে চলে ক্লান্ত এখন, দৃষ্টি নাহি হায়

কে জানে কোথায় ঠিকানা
এবারে পার করে দে না—।

লাজো : এখন আবার কে গান গাইছে?

দীপো : কে জানে!

লাজো : দাঁড়ের ছপছপ শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

দীপো : হ্যাঁ।

লাজো : গাঁয়ের সবাই তো নৌকাগুলো ঘাটে বেঁধেছে। কে হতে পারে?

দীপো : কে জানে? নদীতে জল তো প্রচুর বেড়েছে।

লাজো : হ্যাঁ, হাওয়ার শোঁশোঁ শব্দ শোনো একবার। যেন সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

দীপো : লাজো, ঝড়কে আমার ভীষণ ভয় করে।

লাজো : ঝড় হলেই আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে যেদিন দাদা তোমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

দীপো : সেদিনটা আব মনে করিও না লাজো।

লাজো : কিছুতেই ভুলতে পারি না যে। আমি তো কতদিন বলেছি এই কুঁড়েটা অপয়া—এটা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। তুমিই তো কথা শোনো নি।

দীপো : এ ঘর কি করে ছাড়ব বলো? পুরো ছটা বছর এখানে কাটিয়েছি। এখানেই তোমার দাদা আমায় পাল্কী করে নিয়ে এসেছিল, আর তুমি এই লণ্ঠনের আলোতেই ঘোমটা তুলে আমার মুখ দেখেছিলে, ঘবে নিয়ে গিয়েছিলে। এই কুঁড়েটাকে বড় ভালোবাসি। কত স্মৃতি লুকিয়ে আছে এখানে।

লাজো : এই অপয়া কুঁড়েটাতে তোমার ছেলেটা মরেছিল।

দীপো : হ্যাঁ, আমার টুকটুকে ছেলেটা এখানেই জন্মেছিল, মরেছিলও এখানেই। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল, আলো জ্বলেছে ঘরে ঘরে। আমি ওকে এই হাতে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিলাম। এখান থেকে কি করে যাই বলো তো?

লাজো : আমার এখানে ভীষণ ভয় করে।

দীপো : সকাল-সন্ধ্যে ওর ছোট্ট কবরটা দেখতে যাই আমি। আমার বুকের ধুকপুকুনি ওখানেই চাপা আছে। জানো, আমার মনটাও যেন মস্ত কবর—সেখানে অনেক স্মৃতি, অনেক আশা চাপা পড়ে আছে।

লাজো : এ সব কথা ছাড় তো। যাও লণ্ঠনটা নিয়ে কাশী-বদ্যির কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে এসো। আমি পিসীর কাছে বসছি।

দীপো : যা হাওয়া—লণ্ঠন জ্বলবে না। সব ছায়াগুলো দেওয়ালের উপর কেমন কাঁপছে দেখ। এ ঘরে কতো জিনিসের ছায়া! সারাক্ষণ আমি যেন স্মৃতির ছায়ায় চাপা রয়েছি —এই জাল, দড়ি, ভাঙা দাঁড়। এই ভাঙা দাঁড়টার জোরেই তোমার দাদা কতবার ঐ পারে গেছে।

লাজো : ও তোমার চালচালনে অসহ্য হয়ে চলে গেছে।

দীপো : আমার চালচলনে?

লাজো : নয় তো কি? তুমি সুন্দরের প্রেমে মশগুল ছিলে, কিন্তু তুমি তো জানতে দাদা তোমাকে কি ভীষণ ভালোবাসে। গাঁয়ের সব মাঝিরা একদিকে, দাদা একদিকে। কারো কথা না শুনে ও তোমাকে এখানে এনেছিল।

দীপো : আমি সব ছেড়ে, গ্রামের বহু সুন্দর ছেলেকে অবহেলা করে ওর পিছু পিছু এসেছিলাম।

লাজো : সেই জন্যেই তো ও তোমার জন্যে জীবন পর্যন্ত দিতে পারতো। ও তোমার সব কিছু ক্ষমা করে দিত, কিন্তু তুমিই ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করলে। ডাইনীও তো একটা দিক ছেড়ে দেয়।

দীপো : লাজো, লাজো, ভগবানের দোহাই চুপ করো। চুপ করো।

লাজো : তোমার এসব বিশ্রী ব্যাপারের জন্যেই আমার সঙ্গেও দাদার সম্পর্কটা চিরকালের জন্যে নষ্ট হল।

দীপো : লাজো। এই নৌকোর নামে, ঘাটের নামে শপথ করে বলছি সুন্দরের সঙ্গে আমার সে রকম কোনো প্রেম-ট্রেমের ব্যাপারই ছিল না।

লাজো : পাগ্‌লী, প্রেম কত রকমের হয়! প্রেম কাপড়ের মতো, ফুলের মতো অনেক রকমের, অনেক ধরণের। তবু প্রেম প্রেমই— যেমন শতদ্রুর জলটা জলই। তুমি ভালোবাসতে সুন্দরকে।

দীপো : না, বাজে কথা।

লাজো : আমি জানি সব।

দীপো : তুমি আমার বেইজ্জতী কোরো না লাজো। তোমায় তো প্রেমেই মেরে রেখেছে। তোমার প্রেমিক জ্বরের ঘোরে মারা গেল, সেই শোকে তুমি বিয়েই করলে না। তোমার প্রেমের দোহাই, এ সব কথা আর বোলো না।

লাজো : এখনো সুন্দরকে দেখলে তুমি কেঁপে ওঠো। ওর গলার স্বর শুনলেই আটা মাখায় ব্যস্ত তোমার আঙুলগুলো আটার মধ্যে ডুবে যায়, কান দুটো ভীতু ঘোড়ার কানের মতো সজাগ হয়ে ওঠে।

দীপো : লাজো, লাজো।

লাজো : মেয়েদের কারো একজনের হয়েই থাকা ভালো।

দীপো : (সাশ্রুনয়নে) আমি জানি, সব জানি।

লাজো : তোমার এই চোখের জল আমি অনেকবার দেখেছি, জানি আমি কার জন্যে তোমার চোখে এতো জল আসে।

দীপো : লাজো!

লাজো : আমি যা বলছি, সব সত্যি।

দীপো : কিন্তু লাজো, অন্য লোকের কথা মনে মনে একটু ভাবাও কি পাপ? ছোট্ট একটু সমবেদনা, তার জন্যে হঠাৎ আসা পুলক···।

লাজো : হ্যাঁ।

দীপো : কিন্তু কি করবো? মনটাকে নিয়ে কি করবো? একে আমি টেনে বেঁধে রেখেছি, ঝড়ের থেকে বাঁচিয়ে, ঢেউয়ের থেকে সরিয়ে বেঁধে রেখেছি। ঘাটের এক ধারে ঐ নৌকোর মতো—যাকে নদীর ঢেউ ছুঁয়ে যায়, কিন্তু গড়াতে পারে না, ভাসাতে পারে না। সুরজিতের কিসের হিংসে বলো, ও তো জানতো আমি ওরই একা ওরই।

লাজো : প্রেমে ছেলেরা অবিশ্বাসকে সহ্য করে না। তুমি সুন্দরকে

ভালবাসতে। তোমার দুচোখ ছাপিয়ে ভালবাসার যে চাহনি উপচে পড়তো তা যে কোনো পুরুষকে পাগল করে রাখতে পারে সারাজীবন। তুমি ভালবাসতে সুন্দরকে।

দীপো : কিন্তু এতে আমার দোষ কোথায়। আমার মনটাই যে এমনি। ভগবান এটাকে এমনি করেই তৈরী করেছেন। আমি কি করবো ? আমার নাক, চোখ, মুখ, গলা কিছুই সুন্দর নয়—মনটাও তেমনি শুধু আবেগ ভরা। আমাকে যদি দেখতে কুশ্রী হতো, মুখে থাকতো বসন্তের দাগ, মাথায় কলঙ্কের বোঝা, তাহলে কেউ ভালবাসতে আসত না, সুন্দরও না।

লাজো : এসব বাজে কথা এনো না মুখে।

দীপো : কে জানে সুন্দরের ভালবাসায় কি আছে ? ও সবার থেকে আলাদা—কম কথা বলে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে…। হে ভগবান। আমায় ক্ষমা কর। কি সব আজবাজে বকছি আমি।

লাজো : তুমি সুন্দরের সঙ্গে একা দেখা করনি ?

দীপো : না কখনো না। ও দূর থেকে চলে যায়। আমি নৌকা বাইতে বাইতে ওর কাছ দিয়ে চলে যেতাম। ব্যস্। কিন্তু ওকে দেখলেই আমার শরীরের ভেতরটা কেমন করতে থাকে। মুখে কথা সরে না। ওকে আর কখনো ডাকব না। কেমন যেন ভয় করে আমার।

লাজো : ওকে ভয় পাও তুমি ?

দীপো : না, নিজেকে ভয় পাই। নিজের আবেগকে, ভাগ্যকে।

লাজো : কেন ?

দীপো : সে রাতের কথা তোমার মনে আছে ? সে দিন সুরজিৎ তামাশা (লোকনাট্য) দেখতে গিয়েছিল আখড়ায়। বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে তামাশা দেখাচ্ছিল মশালচী। আমি ঘরে ছিলাম। সুন্দর এলো। নদী সে দিন ফুলে উঠেছে। ও নিজের দাঁড় আর জাল রাখতে এসেছিল। আমার পাশে এসে দাঁড়াল। প্রদীপের আলোয় চকচকে করছিল হাতের পেশীগুলো। আমি ওর হাতটা ছুঁয়ে দেখলাম।

লাজো : পাগ্লী।

দীপো : আমি শুধু হাত ছুঁয়ে দেখলাম—যেন পাথরের তৈরী।

ইচ্ছে করছিল ওকে জলের মতো পান করি এক গণ্ডূষে।

লাজো : পাগ্‌লী এটাই তো প্রেম।

দীপো : আমি শুধু স্পর্শ করেছিলাম। ও আমার গালের নীচে—এইখানে ঘাড়ে যেখানে চুলগুলো ছড়িয়ে আছে—সেখানে আঙুল দিয়ে ছুঁলো। সে দিন ঝড়, জল এমনি, নদীও এমনি ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ওর স্পর্শে আমার প্রত্যেকটা রোমকূপ কেঁপে উঠেছে—ওর প্রথম স্পর্শ...আমি চোখ বন্ধ করে মাথাটা রাখলাম ওর বুকে। ঠিক সেই সময় পিছন থেকে তোমার দাদা এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখে আগুন। হাতে ছিল দাঁড়টা। আমাকে দেখে ও দাঁড়টা ওপরে তুললো—সমস্ত শরীর কাঁপছে ওর—পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলো—আর দাঁড়টা ছুঁড়ে মারল দেওয়ালে। ওটা দু-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো।

লাজো : তারপর ও চলে গেল।

দীপো : আমি ওর পিছন পিছন দৌড়ে এলাম, কামিজ ধরে টানলাম, মিনতি করে বললাম আমার আর সুন্দরের মধ্যে সত্যি তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। মানল না ও।

লাজো : প্রেম যেখানে গভীর, সন্দেহটাও বেশী হয় সেখানে।

দীপো : ও সেই ঝড়ের মধ্যেই নৌকা ছেড়ে দিল। মা সারা রাত অপেক্ষা করে রইল, কত খোঁজ করলাম, কোনো খবর পাওয়া গেল না। নদীর জল নামতে ওর জুতো, লুঙ্গী আর পাগড়ী নদীর পাড়ে পাওয়া গেল। সে সব আমি শুকিয়ে ট্রাঙ্কে রেখে দিয়েছি। এ কুঁড়ে ছেড়ে তাই আর যেতে পারি না। সুন্দরকেও আর কখনো আসতে দিই নি এখানে। মনে মনে ভেবেছি সুরজিৎ যদি কোনো দিন ফিরে আসে, দেখবে আমি এখনও তারই প্রতীক্ষায় আছি।

লাজো : এখন তো ওর স্মৃতিটুকুই রয়ে গেছে—ও আর কখনো ফিরবে না।

(পিসী কেসে ওঠে জোরে)

লাজো : গিয়ে কাশী বদ্যির কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে এসো। রাতেই আবার দমবন্ধ না হয়ে যায়। কাশী বদ্যির ওষুধেই পিসীর একটু

আরাম হয়।

দীপো : নদী যে ভীষণ ফেঁপে উঠেছে। ঢালু পেরিয়ে বদ্যির কাছে যেতে হবে, ঢালুটাও ডুবে আছে।

(গান শোনা যায়)

'পার করে দে না রে'

এ তো সুন্দরের গলা। নৌকা বাঁধছে গাছের সঙ্গে।

লাজো : ওকেই বলো না কাশী বদ্যিকে ডেকে আনবে।

দীপো : তুমি বলে দাও।

লাজো : (চেঁচিয়ে ডাকে) সুন্দর।

দীপো : আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে।

লাজো : তুমি গিয়ে পিসীকে একটু জলপট্টী দাও। আমি সুন্দরকে বলছি কাশী বদ্যিকে ডেকে আনতে। আমার কথা ফেলবে না ও। ঐ তো বিদ্যুৎ চমকালো—ঘাট থেকে চলে আসছে, হ্যাঁ সুন্দরই তো।

দীপো : বৃষ্টি হচ্ছে এখনও, না?

লাজো : একটু, ঝিরঝির করে। নদীর ঢেউয়ের ফেনার ছিটে উঠছে বোধহয়। লণ্ঠনটা দেখাও দরজাটা খুলি।

দীপো : ধোঁয়া উঠে ওপর দিকটা কালো হয়ে গেছে। দাও একটু পরিষ্কার করে দিই।

(লাজো ঝাঁপ খোলে। সুন্দরের প্রবেশ।)

ওফ্—ফ্। নদীতে দারুণ ঝড়। পুরো গ্রামে জল ভরে গেছে।

লাজো : হে ভগবান।

সুন্দর : গাঁয়ের লোকেরা যে যা পারে নৌকায় চাপিয়ে পালাচ্ছে। পাশের গাঁয়ে উঁচু জায়গায় গিয়ে থাকবে।

লাজো : বুটেবালে?

সুন্দর : হ্যাঁ, বুটেবালে। নদী থেকে সব কুমীরগুলো ডাঙায় উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লাজো : তোমার নৌকা।

সুন্দর : বাঁচিয়ে এনেছি। দেবীর গাছে বেঁধে রেখেছি।

লাজো : পিসীর তো খুব শরীর খারাপ। কাশির দমক উঠলে আর থামতেই চায় না। তুমি কাশী বদ্যির কাছ থেকে একটু ওষুধ এনে দাও না।

সুন্দর : ঠিক আছে, যাচ্ছি। কিন্তু মনে হয় কাশী বদ্যিও পালিয়েছে।

লাজো : ওর ঘর তো বেশ উঁচুতে, ও পালাবে কেন? আর এই ঝড় জলের থেকে ও কখনো পালায় না। বারো বছর আগে সেই যেবার বান এলে সারা গ্রাম পালিয়েছিল—ও যায়নি। মেজাজী লোক। একটু যা নেশাভাঙের অভ্যেস আছে। এখন দেখ গিয়ে সিদ্ধি খেয়ে মেজাজে ঘুমোচ্ছে হয় তো। তুমি গিয়ে ওর থেকে একটু ওষুধ এনে দাও। ওর ওষুধে খুব কাজ দেয়, রোগটাকে সমূলে শেষ করে। আর পিসীর ওর ওষুধ ছাড়া কারো ওষুধে কোনো কাজ দেয় না।

সুন্দর : ঠিক আছে, নৌকাটা খুলে নিয়ে চল্লাম আমি। তাড়াতাড়ি ফিরব। কাশীকে একেবারে চাপিয়ে নিয়ে আসব।

লাজো : নিজে যদি আসতে না পারে, ওষুধটা অন্তত এনো। ও ওষুধ জানে। গত কুড়ি বছর ধরে এই পরিবারটাকে চেনে ও। ও পুরিয়া বানিয়ে রেখেছে, কিন্তু তিন দিন ধরে ঝড়ে, জলে যা অবস্থা আমরা কেউ যেতেই পারিনি। পিসী আগে যতবার ওর ওষুধ খেয়েছে, সুস্থ হয়ে উঠেছে।

সুন্দর : আচ্ছা, চলি!

(সুন্দরের প্রস্থান। লাজো ঝাঁপ বন্ধ করে। খাটে শায়িতা পিসী বেশ জোরে কাসতে থাকে।)

লাজো : (চেঁচিয়ে বলে) দীপো, আগুন থেকে গরম পাথরটা বের করে আনো, পিসীকে সেঁক দিতে হবে। শোনো, পিসীকে বোলো না যেন, সুন্দরকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েছি। ও জানলে হয় তো ওষুধই খাবে না। সুন্দরের ওপর ভীষণ রাগ ওর।

(খাটে পিসী কাসতে থাকে।)

পিসী : কে গেল কাশীর কাছে ওষুধ আনতে?

লাজো : পাশের বাড়ীর নাথুকে পাঠিয়েছি।

পিসী : নাথু তো রাস্তাতেই পুরিয়া ফেলে দেবে। সেদিন ওকে নৌকাটা ঘাটে বাঁধতে বললাম, দাঁড়টাই ভেঙে রাখলো।

লাজো : তুমি ঘাবড়ো না, ও ঠিক নিয়ে আসবে।

পিসী : জীবনকে বলতিস, ও নিয়ে আসত।

লাজো : জীবন তো গাড়ী বলদ নিয়ে কালই গ্রাম ছেড়ে গেছে। বৌ-বাচ্চা সব নিয়ে চলে গেছে। পেছনের ঘরটায় ল্যাওড়া বলদটা রয়ে গেছে, একা-একা চেঁচাচ্ছে বেচারা।

পিসী : কে জানে, ভগবান এ গাঁয়ের ওপর কিসের শোধ তুলছে। প্রত্যেক চার বছরে এমনি বান আসে। ওহ্ ভগবান।

লাজো : (দীপোকে) তুমি ছাইয়ে আলু চাপা দিয়েছো?

দীপো : হ্যাঁ।

লাজো : কটা?

দীপো : তিনটে। আমার ক্ষিধে নেই।

লাজো : আমার কলজেটা ক্ষিধেয় চাপা পড়ে আছে।

দীপো : পিসী ঘুমিয়ে পড়লো বোধহয়।

লাজো : ভালই হয়েছে। ঘুমোলে একটু আরাম পাবে।

দীপো : এখনও জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

লাজো : বেচারী! সারাটা জীবন বিপদের মধ্যে কাটালো। আমি যখন ছোট ছিলাম, মা মরে গেল। পিসীই আমাদের দুজনকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। মনে পড়ে, রাত্তিরে ঘাসে যখন জোনাকি জ্বলত, পিসী আমাদের রূপকথার গল্প বলতো। কখনও বলতো যাদুকর, দেবীর গল্প। কখনো সমুদ্র আর মাছধরার। সুরজিৎ মাছ ধরতে গেলে ঝুড়ি ভর্তি মাছ আনতো। পিসী মাছ বাছত। তুমি মাছ বেছে নিয়েছ?

দীপো : না, অমনি ঘড়ায় চাপা আছে।

লাজো : আমি পিসীর কাছ থেকে মাছ কোটা শিখেছিলাম। কতবার সুরজিৎ নদীতে সাঁতার কাটতে যেত, পিসী ওর পেছন পেছন যেত নৌকা করে, হাঁপিয়ে পড়লে নৌকায় করে ফেরৎ আনত ওকে।

এখন তো নড়তেও পারে না।

দীপো : কিছু খেতেও তো পারে না। কাল ডাল বানিয়ে দিলাম খেলো না—হাতে করে বাটিটা সরিয়ে দিল।

(বিদ্যুৎ চমকায়। লাজো ঝাঁপ খোলে। কাদামাখা সুন্দর প্রবেশ করে।)

ওষুধ এনেছো ?

সুন্দর : হ্যাঁ, এই তিন পুরিয়া তিন ঘণ্টা পরে পরে।

লাজো : কি ভাবে।

সুন্দর : গরম জল কিংবা পথ্যির সঙ্গে।

লাজো : দাও। ভগবান তোমার ভাল করবেন।

(সুন্দরের প্রস্থান। লাজো পুরিয়া নিয়ে পিসীর কাছে দেয়।)

লাজো : দীপো, পথ্যি গরম হয়ে গেছে ?

দীপো : হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরেই উথ্‌লাচ্ছে।

পিসী : (সক্ষোভে) কোলে তুলে নাও ভগবান।

দীপো : কি হলো পিসী ব্যথা করছে ?

পিসী : (কেসে) এখানে একা পড়ে আছি। রোগে কাসিতে আর কিছু নেই। রাত দিন আর কাটে না। নদীর ঢেউয়ের মতো যায় আবার আসে।

দীপো : পিসী, একটু ঘুরে শোও তো। পিঠে একটু সেঁক দিয়ে দিই।

পিসী : পাথরটা বেশী গরম নয় তো ?

দীপো : ননা। জল ছিটিয়ে কাপড়ে জড়িয়ে এনেছি।

লাজো : কি পিসী, ব্যথাটা কমছে ?

পিসী : এখনও তেমনি আছে।

লাজো : নাও কাশী বদ্যি পুরিয়া পাঠিয়েছে।

পিসী : এ ওষুধটা হয় তো কিছু কাজ দেবে।

লাজো : এই তিনটি পুরিয়া তিন ঘণ্টা পরপর খেতে হবে।

পিসী : কি করে।

লাজো : গরম জল কিংবা পথ্যির সঙ্গে।

দীপো : পিসীর বুকে গরম পাথরটা থাক, আরাম পাবে। ব্যস, এক পুরিয়া এখন, বাকীটা পরে।

লাজো : আমি ওষুধ দিচ্ছি পিসীকে।

দীপো : ঝাঁপ বন্ধ করোনি বোধহয়, নদীর জলের ছিটে আসছে।

লাজো : যাও, ঝাঁপ বন্ধ করো।

(লাজো পিছনের ঘরে যায় ওষুধ তৈরী করতে। দীপো ঝাঁপ বন্ধ করতে এগিয়ে এসে বাইরে উঁকি মেরে দেখে।)

দীপো : (চাপা স্বরে) একি সুন্দর এখানে এখনো দাঁড়িয়ে।

সুন্দর : হ্যাঁ, এই যাচ্ছিলাম।

দীপো : তোমার নৌকা কোথায়।

সুন্দর : বাইরে। তোমাকে এক পলক দেখার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম।

দীপো : ঠিক আছে এখন যাও।

সুন্দর : যাচ্ছি।

দীপো : শোনো, তোমার মাথায় ওটা কিসের দাগ ?

সুন্দর : রাস্তায় ভীষণ অন্ধকার ছিলো। এক জায়গায় পিছলে পড়ে যাই, একটা পাথরের টুকরো পড়েছিলো, ওটাই লেগেছে এখানে।

দীপো : ইস্। এখন যাও তুমি।

সুন্দর : সেই রাতের পর কখনো আসিনি। পথে আসতে দেখে নিই তোমায়।

দীপো : এই ঝড় জলে কোথায় গিয়েছিলে ?

সুন্দর : টেরু মহরার ঘোড়াটা পিছলে জলে পড়ে গেছে। স্রোতে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে। ওটাকেই খুঁজতে গিয়েছিলাম।

দীপো : পেয়েছো ?

সুন্দর : না।

দীপো : তুমি কেন গেলে ঘোড়া খুঁজতে ? কিছু অঘটন ঘটলে কি হত ? গাঁয়ের সবাই চলে গেছে, তুমি গেলে না কেন ? এখানে তোমার কি এমন গোয়াল আছে যে সামলাতে হবে।

সুন্দর : ঝড়কে ভয় পাইনি আমি। ভেবেছিলাম ঝড়ের মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখাও হবে না। কে জানে, এই ঝড়ের রাতে যদি এখান থেকে কেউ আমাকে ডাক দেয়—

দীপো : (ঘাবড়ে গিয়ে) আবার···না না···তুমি যা—ও।

সুন্দর : আবার--হ্যাঁ— ঐ রাত ঐ ঝড়। তোমার স্পর্শে আমার মনটা কেঁপে উঠলো ঝনঝন করে। তোমার সেই ছবিটা চিরকালের জন্যে মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেছে।

দীপো : সুরজিৎকে আমার ভয় করে। সেদিনের পর থেকে ভয়টা আরও বেড়ে গেছে।

সুন্দর : এটা তোমার ভুল।

দীপো : কতবার ভেবেছি তোমায় ডাকি, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরয় না। মনে হয়, যদি তোমায় ডাকি, হয় তো সুরজিৎ ওপার থেকে চীৎকার করে উঠবে।

সুন্দর : তুমি পাগল হয়ে গেছো। কতো বছর হয়ে গেল বলো তো?

দীপো : চার।

সুন্দর : মনে হয় যেন কালকের কথা। যেন সে সময়টা এখনি শেষ হলো। সেই রাতে আর এই রাতে তফাৎ কোথায়। দীপো, তুমি এমন কথা আর বলো না। জানো, রাতে এই কুঁড়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়াই তোমায় দেখবার জন্যে। ঠাণ্ডার মধ্যে রাতে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি, গলা শুকিয়ে যায়—আমার স্বপ্ন, কামনা আমায় শেষ করে দিচ্ছে দীপো।

দীপো : সুন্দর, তুমি রাতের অন্ধকারকে ভয় পাও না, এই ভীষণ বানকে।

সুন্দর : জল তো সব একাকার করে দিয়েছে।

দীপো : (কেঁপে উঠে) কে জানে জলের নীচে কি ডুবে আছে। কিছুই তো দেখা যায় না।

সুন্দর : অন্ধকারে তোমার চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছি। ভিজে ভিজে দুটো চোখ।

দীপো : আমায় ছুঁয়ো না, সে রাতের কথা এখনও ভুলতে পারছি না আমি।

সুন্দর : সুরজিৎ আর ফিরে আসবে না। কেন অকারণ ভাবছ? রাতদিন ঐ ভয়, সংশয়ের ছায়ায় থেকে নিজের শরীরটা নষ্ট করছো? চারবছর হয়ে গেল ও গেছে। ওর ভেজা কাদামাখা জুতো, পাগড়ী, লুঙ্গী সব পাওয়া গেছে। নিশ্চয় কুমীরে খেয়ে ফেলেছে ওকে। ওকি তোমার হাত কাঁপছে কেন?

দীপো : ভয়ে।

সুন্দর : কিসের ভয় তোমার?

দীপো : কিসের যেন আওয়াজ?

সুন্দর : ঘাটের বাঁধা নৌকার আওয়াজ, সঙ্গে জলের ছপ্ ছপ্—।

দীপো : মনে হচ্ছিল যেন কেউ জল পেরিয়ে যাচ্ছে। যেন কাদামাখা ভারী কোন জিনিসকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনের মধ্যে এমন সব অদ্ভুত ভাবনা আসে।

সুন্দর : সব ভুল।

দীপো : কে ওখানে?

সুন্দর : কেউ না। তোমার ভাবনাগুলো এমনিই বেড়িয়ে আসে।

দীপো : তোমার যুক্তি শুনলে মনে জোর পাই।

সুন্দর : তোমার বুকের ধুকপুকুনি এখান থেকে শুনতে পাচ্ছি।

দীপো : কতবার মনে হয়েছে আমার বুকটা একবার খুব জোরে ধক্ধক্ করে উঠেই একেবারে থেমে যাবে। তোমার স্পর্শ আমার শরীরে বিদ্যুৎ বইয়ে দিয়েছে, নেচে নেচে বয়ে গেছে সেই বিদ্যুৎ, তার শুরু নেই শেষ নেই। (গভীর আশ্লেষে এগিয়ে যায়) সুন্দর।

সুন্দর : হুঁ।

দীপো : আমার মাথাটা ভারী হয়ে উঠছে। চোখে বিদ্যুতের জ্বালা। তোমার বুকে মাথা রেখে আমার বুকটা যেন কেমন করছে।

সুন্দর : দীপো :

দীপো : (ভারী স্বরে) আমার রক্তে কেউ যেন নৌকা বাইছে।

নিঃশ্বাসে ঝড় উঠেছে দারুণ। কাশী বদ্যির ওষুধে পিসীর ব্যথা সেরে গেছে, এমন কোনো ওষুধ নেই যা সমুদ্রকে শুকিয়ে দেয়, ঝড়কে শেষ করে দিতে পারে? এমন কোন ওষুধ যা আমার মনের মধ্যে ঝড়ের দাপাদাপি বন্ধ করে?

সুন্দর : এতদিন ধরে তো এমনি ঝড়েরই প্রতীক্ষা করছি আমি।

দীপো : এই ঝড়ই আমার জীবনকে পৃথিবী থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

সুন্দর : এ রাত আর সে রাতে কোনো তফাৎ নেই। সময় একটা ছোট ঘূর্ণীর মতো বয়ে গেছে। ঐ রাতটা লম্বা হয়ে যেন এই রাতের মাথায় বোঝা হয়ে বসেছে। তোমার কাঁপা কাঁপা স্বরে, তোমার উষ্ণ স্পর্শে, তোমার বুকের কাঁপুনিতে

(নেপথ্যে নদীর ঢেউয়ের আওয়াজের মতো হাসির শব্দ। আবার স্পষ্ট শোনা যায়। দীপো ভয় পেয়ে যায়।)

কে? দীপো, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? কে ওখানে।

দীপো : বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম ঐ ঘাট থেকে ও আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

সুন্দর : তুমি ভুল দেখেছো।

(আবার হাসির শব্দ)

দীপো : না না, এটা সুরজিৎ। ঐ তো তোমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ও।

(কাদামাখা অবস্থায় ভেতরে আসে সুরজিৎ।)

সুরজিৎ : হ্যাঁ, আমি সুরজিৎ। আমাকে দেখে ভয় পেলে কেন?

দীপো : সুরজিৎ।

সুরজিৎ : আমি জানতাম যা দেখেছি সব সত্যি, সব সত্যি

দীপো : না সুরজিৎ, না। (মিনতি করে) না—।

সুরজিৎ : তুমি বুক থেকে মাথাটা তুলে নিলে কেন।

দীপো : (কঁকিয়ে ওঠে) না, না সুরজিৎ না।

সুরজিৎ : আমি এখান থেকে ওপারে চলে গেছি। আমার জুতো, লুঙ্গী, পাগড়ী সব নদীর স্রোতে টেনে নিয়েছে। আমি সব বন্ধন কাটিয়ে ওপারে চলে গেছি। সব আশা, কামনা সব ছেড়ে...কিন্তু কি করবো?

চার বছর ধরে তোমার শেষ কান্না ভেজা স্বর আমার কানে বাজছে...

দীপো : (ফুঁপিয়ে উঠে) আমি...

সুরজিৎ : তোমার এই ফোঁপানো সারাক্ষণ আমার মন তোলপাড় করেছে। আমি সারাক্ষণ ভেবেছি হয় তো তুমিই ঠিক, ভুলটা আমারই। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি চার বছর ফিরে আসিনি, নিজের ভাগ্যের বিচারকে ভয় পেয়েছি আমি। মনের মধ্যে একটা আশাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। আগে এলে এসব শেষ হয়ে যেত। তোমার শেষ কান্নার আওয়াজ আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছিল না। যতই দূরে গেছি ততই তোমার মিনতি মাখা আর্তনাদ, কান্না যেন ক্রমশই বেড়ে গেছে। চার বছর সেখানে কাজ করেছি, সেখানে সমস্ত কাজের মধ্যেও তোমার কথা, তোমার হাসি, তোমার স্পর্শ অনুভব করেছি। ক্ষেতের জলের মধ্যে তোমার ছায়া দেখতে পেতাম। বলদের গলায় ঘণ্টার মধ্যে তোমার হাসির শব্দ শুনেছি···উহ্, কে জানে, কেন যে ফিরে এলাম ?

দীপো : (তেমনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে) আমার কথাটা শোনো। শোনো, কথা শোনো। তুমি যা দেখেছ, মিথ্যে, সব মিথ্যে। আমায় বিশ্বাস করো, যা দেখেছ, সব মিথ্যে। সুরজিৎ, বিশ্বাস করো আমায়।

সুরজিৎ : আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করবো, না তোমাকে ? আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া চিন্তাগুলোকে বিশ্বাস করবো, না সুন্দরকে ?

দীপো : সুন্দর তো পিসীর জন্যে ওষুধ নিয়ে এসেছে। ওটা দিয়েই চলে যাচ্ছিল। আমি ঝাঁপ বন্ধ করতে এসে ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম। চার বছর পর প্রথম বার···

সুরজিৎ : হাঃ, হাঃ, হাঃ

দীপো : সুন্দরের কোনো দোষ নেই। লাজো ডেকেছিল তাই সুন্দর ওষুধ আনতে গেছে, আর...

সুরজিৎ : হাঃ হাঃ হাঃ। সুন্দর যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু, আমার সঙ্গে নৌকো ঠেলত, নৌকো রাখত, যে আমার নৌকোকে কতবার ঝড়ের মুখ থেকে বাঁচিয়েছে, যে আমার বন্ধু সে আমার পরে—

সুন্দর : কিন্তু আমি—

সুরজিৎ : কথা বলিস না সুন্দর। তোর কিছু বলার দরকার নেই। তুই আমার সামনে কখনো মুখ তুলে কথা বলিস নি, আজও বলিস না।

দীপো : (অশ্রু নয়নে) এই ভয়টাই করছিলাম। আমায় ধরার জন্যে সবাই ওৎ পেতে আছে !

সুরজিৎ : চার বছর ধরে আমি যেন রোজ দেখেছি তোমার মাথাটা সুন্দরের বুকের ওপর রাখা। শেষবার তোমার সেই বিহ্বল চেহারা যার ওপর সুন্দরের ছায়া দুলছিল সে তো হাজার মেটালেও মিটবে না। ওটাই মেটাতে এসেছি আমি।

দীপো : (অনুনয় করে) থামো একটু থামো। কথা শোনো। আমার কথা তোমায় শুনতেই হবে। তুমি যা বলছ, তা মিথ্যে, মিথ্যে, সব মিথ্যে—তোমার জন্যে আমাব পথ চেয়ে থাকার দোহাই---তোমার স্মৃতির দোহাই—

(সুরজিৎ প্রস্থানোদ্যত। দীপো ওর হাত ধরে নেয়। অবশ স্বরে—)

আবার কোথায় যাচ্ছো।

সুরজিৎ : আমায় ছাড়ো, যাও, চলে যাও।

দীপো : (কান্না ভরা স্বরে) জীবনের অন্ধকার রাতগুলোয় তোমার পথ চেয়ে থেকেছি। চোখ পেতে রেখেছি পথের ওপর। কতবার এই ঘাটে এসেছি তোমার জন্যে তার ইয়ত্তা নেই। একটু চোখ বুজে আসতেই তুমি এলে—

সুরজিৎ : আমায় যেতে দাও।

দীপো : কোথায় যাবে ? কোথায় ?

সুরজিৎ : যেখানে আমার স্বপ্নের টুকরোগুলো পড়ে আছে। সারাটা ঘাট নদীর কোলে একা। আর কখনো ফিরে আসব না।

দীপো : আমি এই ঘরে তোমার বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে আছি, তোমার স্মৃতিকে—শোনো, যেও না।

(সুরজিৎ ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। নদীর ঢেউয়ের গর্জন আর হাওয়ার শোঁশোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে।)

সুন্দর : চলে গেল, আবার চলে গেল।

দীপো : (কাঁদতে কাঁদতে রেগে গিয়ে) হ্যাঁ, তুমিও যাও। যাও না—

সুন্দর : দীপো, আমার কথা শোনো।

দীপো : যাও।

সুন্দর : তুমি যে আমাকে বেঁধে রেখেছ দীপো।

দীপো : যাও, চলে যাও, এক্ষুণি। ঝাঁপ বন্ধ করতে হবে আমার। (চীৎকার করে) যাও, চলে যাও—।

(সুন্দরের প্রস্থান। দীপো ঝাঁপ বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপাতে থাকে।)

(যবনিকা)

ওপর তলা

—কর্তার সিং দুগ্‌গল

চরিত্র-লিপি

একটি লোক

স্থান

একটি ছাদের ওপর খোলা ঘরের জানালা

[কোনো এক বাণিজ্যিক শহরের সিভিল লাইনের এক বাড়ীর ওপর তলার একটি ঘর। এই ঘরের খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে, এক প্রৌঢ়। জানালা দিয়ে সামনে দেখা যায় পথ, বাড়ীর গেট, পাশের বাড়ীর উঠান আর বারান্দা। দূর থেকে স্টেশানের রেলগাড়ীর আওয়াজ শোনা যায়।

জানালায় দাঁড়ানো লোকটি মন খুলে হাসছে। মনে হচ্ছে ওর চাকরের কাছ থেকে কিছু শুনে ও হাসছে।

পর্দা ওঠার সময় চাকরের পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে, পুরো পর্দা উঠতে সে আড়ালে চলে যায়।

হাসিটা ক্রমশ সাধারণ হাসি থেকে বদলাতে বদলাতে ঘৃণ্য হয়ে যায়, ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকে ঘৃণার প্রকাশ।]

লোকটি

(হাসতে হাসতে)

মেমসাহেব স্টেশানে গেছেন
নিজের প্রেমিককে বিদায় জানাতে! (এখনও হাসছে)
প্রেম নিজে হেঁটে চলে গেল
কামনাকে আহুতি দেবে সে! (হাসি বন্ধ করে)

মেমসাহেব স্টেশানে গেছেন।
নিজের হাতের উষ্ণতা দিয়ে শেষবার
অন্য কোনো পুরুষের আঙুলে আরাম দিতে।

মেমসাহেব স্টেশানে গেছেন
শেষবারের মতো
নিজের মদালসা দৃষ্টি দিয়ে
অন্য কোনো পুরুষের পলকের নীচে
স্বপ্ন জাগাতে।

মেমসাহেব স্টেশানে গেছেন
শেষবার বিবাহিতা মহিলার ঠোঁট দুটো
পরপুরুষের স্পর্শে অশুচি করাতে।
যেন কেউ পাতার উপরে বাসা বাঁধে,
পাতাটাই ঝড়ে যায় নীচ থেকে ;
যেন কেউ হৃদয়ের কালিমা মাখিয়ে
আঁধারকে গহন গভীর করে তোলে:
কেউ যেন পথ খুঁজে খুঁজে
বন্ধ গলিব মুখে থমকে থেমেছে।

লোকটি

(রাগে দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে)
মেমসাহেব স্টেশানে গেছেন
আজ তাব 'ঢোলা সিপাই' চলে যাবে—
দূরে, বহুদূবে যেখানে সশব্দে শুধু গুলি বরষায়
যেখানে বৃষ্টি নামে বোমার আববণ ফুঁড়ে
যেখানে রক্তের নদী বয়
মৃত্যু ডাক দেয় একই স্বরে
বড়ো ছোটো ভেদাভেদ ভুলে
যেখানে প্রলয় ঘুরে ফেরে
যে ঘরে কাঁদার কেউ নেই
যার জন্যে প্রতিবেশী মহিলারা
স্বামী-পুত্র ভুলে
তার জন্যে পথ চেয়ে থাকে।

লোকটি

(স্বর কর্কশ হতে থাকে)
কখনো এমন শুনেছে কেউ ?
আদিম আদমের কাল থেকে
কখনো শুনেছো কি ?

পয়ত্রিশ বছরের বর্ষীয়সী স্ত্রী
আবার প্রেমের খেলায় মেতে গেছে ?
কখনো এমন ঘটেছে নাকি
তিনটি সন্তানের জননী সব ভুলে
অন্য কারো তরে পাগল হয়েছে ?
কখনো শুনেছ তুমি
পনেরো বছর ধরে একই ঘরে বাস করে
নিজ হাতে ঘর ভেঙে চলে যাওয়া।

লোকটি
(সাশ্রু নয়নে)

রাজী !
কিন্তু তুমি তখন তো চলে যাওনি—
যখন আমার ঘরে খাবার ছিল না
যখন ভাগাভাগি করে একটু খাবার খেয়েছি
যখন তোমার তৃষ্ণার্ত বুকে দুধ ছিল না
তখন তো ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে
শিশুদের ভুলিয়েছ।
সেই গানে সন্তানের পিতার গুণ গাইতে
তোমার ক্লান্তি ছিল না,
যখন তোমার চোখের জল লুকোতে
কি সরল শুভ্র ভাবে হাসতে আমার সামনে।
তোমার ঠোঁটে বারবার দেখেছি
হাসির ঝিলিক।

রাজী !
তখনও তো তুমি চলে যাওনি
যখন খাটের ওপরে আমি
রোগে জীর্ণ শয্যার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম
ডাক্তার তোমায় কিছু বলতো
কিছু আমায়।

কেউ আমার কাছে আসত না
আমার ময়লা করা চাদর ধুয়ে
তখন তুমি ক্লান্ত হ'তে না,
আমার ভিজিয়ে দেওয়া কাপড়
বদলে দিতে কোনো গ্লানি ছিল না তোমার।
আমার নোঙরা রুগ্ন ঠোঁটে তুমি চুমু খেতে
আমার শীর্ণ বাহু তুলে নিয়ে
নিজের চোখের ওপর রাখতে।
কত রাতের পর রাত জেগেছ আমার জন্যে।
ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করেছ
আমার শরীরের জন্যে।

রাজী।

তুমি তখনও চলে যাওনি
যখন অর্ধেক রাত কাবার করে বাড়ী ফিরেছি
যখন আমার সারা শরীরে দুর্গন্ধ
সেই গন্ধ যার জোরে
মানুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে
তার অধিকার কেড়ে নিতে পারে।
যখন আমার ঠোঁটের থেকে চিহ্ন মুছতো না—
অন্য কোনো মহিলার চুম্বনের চিহ্ন।
যখন আমার চোখে
উলঙ্গ নেশা, সর্বনাশের ছায়া
মিথ্যাভাষণ যখন আমার অস্ত্র
তখনও তো তুমি
জানালায় দাঁড়িয়ে আমার পথ চেয়ে থাকতে।
মাতালের মত্ত পদক্ষেপ নিয়ে
আমি যখন বাড়ী ফিরতাম
তুমি আমায় ধরে ধরে নামাতে ট্যাক্সি থেকে।
(চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ে)

লোকটি

আর আজ,
যখন আমি বাড়ীর মালিক
তিন সন্তানের পিতা
যখন পেঁয়াজের কুচিও মুখে তুলি না
তখন তুমি ছেড়ে গেলে।
আজ মদ ছুঁই না
কোনো রকম দুর্ব্যবহারের সুযোগেই নেই,
যখন কোনো পরস্ত্রীর দিকে
চোখ তুলে তাকাই না
ভাবি না তোমার অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব বলে।
তোমায় ঘরে না দেখলে
আমার ফুলের মতো কোমল ঐ শিশুগুলি
তোমায় খোঁজে।
তুমি তখনই চলে গেলে
যখন যাত্রীর চলার শক্তি নিঃশেষিত।
যখন পথিক বিশ্রামের জন্যে বসেছে।
যখন গান শুনতে মন চায়
তখনই চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে ক্লান্তিতে।
তুমি তখনই চলে গেলে
যখন লক্ষ্য নিজে থেকেই
পথিকের কাছে চলে আসে।
তুমি তখনই চলে গেলে
যখন শিশুরা ক্রমশ তোমারই মতো
হয়ে উঠছে।
একেবারে তোমার মতো—
তোমার মতো হাসি,
তোমার মতো চলনবলন।

তুমি তখনই চলে গেলে
যখন ওদের প্রয়োজন পথ দেখানোর
যে পথে ওদের চলতে হবে।
তুমি এখন চলে গেছ—
রাতে চোখের পাতা পড়ে না আমার।
যখন ঘরের দেওয়ালগুলোও
তোমার পথ চেয়ে থাকে।
যখন পরপর টেলিফোনে স্বর
কেবল তোমাকেই খোঁজে,
যখন কুঁড়িরা তোমার হাতের
কোমল স্পর্শকে খোঁজে।
তুমি এমন সময় গেলে
যখন তোমার নিজের হাতে লাগানো
গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে গেছে।

লোকটি

(নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে)

দেড় বছর হয়ে গেল
এই জানালায় দাঁড়িয়ে কারো হাসি
শোনা যায়নি।
সত্যধর্ম ন্যায়ের কোনো
আলোচনা নেই।
দেড় বছর হয়ে গেল
মনে হচ্ছে
এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি
যেখানে বৃক্ষ আছে রস নেই,
রোদ আছে তাপ নেই,
কেবলই কনকনে শীতের স্পর্শ।

কনকনে শীতে অজানা পথে বরফের শৈত্য
পশুর পদচিহ্নলাঞ্ছিত
পুকুরপাড়ের কাদায় ঠাণ্ডা
ভাঙা কুঁড়েতে বরফ পড়ার কনকনানি।
গন্ধহীন ফুলের মতো
নিরুত্তাপ স্পর্শের মতো
ফিকে হাসি —নীরস, নিরর্থক।

লোকটি
(স্মৃতিতে ডুবে গেছে যেন)
তখন বসন্ত কাল
গত বছরে
সেই ফৌজি ক্যাপ্টেন
আমার প্রতিবেশী হয়ে এলো।
এই জানালায় দাঁড়িয়ে
আমি আর আমার সন্তানের জননী
কতক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে
তাকে দেখেছি।
ঝিরঝিরে বৃষ্টি।
চারিদিকে আবর্জনার স্তূপ।
জাহাজের মতো বড়
ঠাসাঠাসি ভীড় বাস এলো একটা,
সঙ্গে বেঢপ জুতো পরা ফৌজি আর্দালী,
বড় বড় ট্রাঙ্ক আর সিন্দুক নামানো হলো,
তাড়াতাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল ঘরে
যেমন সহজে উলের গোলা নিয়ে খেলা যায়।
কথায় কথায় ক্যাপ্টেনকে সেলাম করছে আর্দালী,
আর ও মুখে সিগারেট নিয়ে
বারান্দায় পায়চারী রত।

জানালায় দাঁড়িয়ে আমরা বহুক্ষণ দেখেছি
এই দৃশ্য।
হাওয়ার গতি বেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে এলো,
আমার স্ত্রী চাদর থেকে
জালিদার দোপাট্টা নিয়ে মাথা ঢাকছিল,
সরে যাচ্ছিল বারবার দোপাট্টা।
জানালাটা বন্ধ করে দিলাম।
আমার শোয়ার ঘরটা
যেন সিগারের গন্ধে ভরে গেছে।
এই নিবিড় সন্ধ্যায় ওখানে দাঁড়ানো আনমনা ওকে
পিছন থেকে এসে ধীরে চুমু খাই
মনে হল
ওর ঠোঁটেও যেন সিগারের গন্ধ আছে
আমার মুখও
সিগারের স্বাদে ভরে গেল।
তারপর প্রতিদিন
সিগারের মৃদু গন্ধ পেয়েছি—
চাদরে, বালিশে, জলে, থালায়, বাটিতে,
ওর চুলে, হাসিতে, আবেশে
সিগারের মৃদুগন্ধ—
এমন কি ফুলদানীর ফুলেও।
দরজা জানালা বন্ধ করে রেখেছি
তবুও সেই গন্ধ,
কত ধূপ জ্বালিয়েছি রাতদিন
নিষ্ফল, ব্যর্থ হয়েছে সব।
ওর দিকে একদিন তাকিয়ে ছিলাম
হঠাৎ বলল,
'কি সিগারেট খাও,
খেতে হয় তো খাও সিগার,'

আমার আঙুলে ধরা সিগারেটটা
কখন যেন মেঝেয় পড়ে গেছে।
কার্পেট পোড়ার গন্ধে টের পাই ঘটনাটা।
আমার সারা শরীর যেন জ্বলে উঠলো।
ও বারবার বলছে,
'আমার বিয়ের কার্পেটটা
পুড়ে ছাই হয়ে গেল'।
মধ্যরাত পর্যন্ত
প্রতিবেশী মাতালের প্রলাপ
ওর ভালো লাগতে শুরু করল।
টলে টলে মাঝরাতে বাড়ী ফেরা লোকগুলোকে
ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো।
তারপর ও কেমন যেন হয়ে গেল—
ক্লান্ত, বিষণ্ণ, হারিয়ে যাওয়া
ভাব ওকে ঘিরে থাকে সারাক্ষণ।
একটা ভয়, আতঙ্ক
ওকে ঘিরে থাকে
যেন কোনো গভীর চক্রান্তের ভূমিকায় ভয়।
ও জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে, কেবলই দাঁড়িয়ে থাকে।
শাড়ী বের করে, পরে
আবার খুলে রাখে
আয়নার সামনে বসে
একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখে।
একরাতে ক্লান্ত ঘরে ফিরে দেখি
চুপিসাড়ে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে
যেন পরের ক্ষেতে ঢুকে পরা কোনো গাভী
ক্ষেতের মালিকের দিকে চোরা চোখে চায়
আমার দিকে তাকিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ে।
চোখে অবিরল অশ্রুধারা।

কাঁদে, অবিরাম কাঁদে।
কেঁদে কেঁদে দম বন্ধ হয়ে যায় ওর।
কি শুধাবো ওকে ?
ওরই বা কি আছে জবাব ?
বিবশ বিফল আমি
ওর পাশে শয্যার ধারে গিয়ে বসি।
কোনো কথা বলিনি তো ওকে—
ভালমন্দ কিছুই বলিনি।
ওর চোখ বারবার যেন বলছে,
'তুমি কেন আমায় সন্দেহ করছ না ?
বোকছো না, চীৎকার করছ না কেন ?'
নিথর পাথর আমি ওকে দেখি
ডাঙায় মাছের মতো ছটফট করে।
সারা রাত, সারা রাত ওকে দেখি
অশ্রুময়ী, অসহায় বিছানায় একা।
ও তো কোনো লতা নয়
যার কিছুতেই কিছু এসে যায় না।
সেই রাত আর আজকের দিন—
আর কখনো আমার চোখের দিকে—
চোখ তুলে তাকায়নি ও।
এক ঘরে থেকে
একই ছাতের নীচে তবুও
দুজনের মধ্যে যেন কয়েক ক্রোশের ব্যবধান।
তারপর থেকে আমি কি দেখিনি ?
আমার ভিতরে তার স্বামী
কি না সহ্য করেছে ?
আমার ভিতরের পিতা
কি না সহ্য করেছে ?
আমার ভিতরের মানুষটা

কেমন করে নিজেকে হত্যা করলো
ওর নখ-পালিশের রঙ
বদলে গেল।
ওর গালের রক্তিমাভা
ক্রমশ রঙ পালটালো।
সারাজীবন সামলে রাখা চুলগুলো
ও কাটিয়ে নিল।
প্রথম যেদিন ওর ছাঁটা চুল দেখি
সারারাত আমার বিনিদ্র কেটেছে
কারো কাছ থেকে তার সখের বাগান
কেউ ছিনিয়ে নিল, বিনা প্রতিবাদে
তবু সে তো
একটি লতাকে স্মরণ করে শুধু কাঁদে।
শেষ অবধি আমার নিজের মনকে বোঝালাম
কতো কি, কতো কি বোঝালাম মনকে।
মেঝেতে বসে হাতে কোনো ছুরি পেলে
আমার আঙুলগুলো নিশপিশ করতো।
আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কখনো গরম হয়।
কখনো শীতল।
কখন অন্ধকার রাতে
একা একা নিজের ঘরে পায়চারী করতে করতে
আমার আঙুলগুলো
পকেটে রাখা রিভলবারটাকে সস্নেহে জড়াতো।
স্বপ্নে কতবার নিজের হাত
রক্তে রঞ্জিত করেছি।
কতবার স্ত্রীর শিথিলতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছি।
কতবার ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছি
কত, কতবার।
বন্ধ ঘরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি কতবার।
কতবার চোখ বুজে নিষ্ফল আশায়
দূর আকাশের কাছে ন্যায়ের প্রার্থনা করি।
কতবার উঁচুতে উঠে ভেবেছি
পা-টা পিছলে গেলেই ভাল হয়।
নদীর ঢেউ বারবার আমায় তীরে আছড়ে ফেলেছে।
তীরে আছড়াতে আছড়াতে
হেসে হেসে ফিরে গেছে ঢেউ।
আমার সন্তানেরা কতবার
আমার বুকের কাছে এসে পিতার উত্তাপ পেয়ে
চোখের তারায়
তাঁদের মাকে খুঁজেছে।
আমার যে চাকর সারাক্ষণ আমায় নিয়ে ব্যস্ত
তারও প্রত্যেকটা কথা
আমার বুকে গুলির মতো বিদ্ধ হয়েছে।
প্রতিবেশীরা কথার ছলে স্ত্রীর কথা তুললে
আমার খারাপ লাগতো
ক্লাবে আর গলিতে এবং অফিসে
কি বলে কে জানে।
তাদের না শোনা কটূক্তি।
যেন আমি হাজারবার শুনেছি।
লোকদের মিথ্যে কথা বলতে
কতবার নিজের কাছেই মিথ্যাচরণ করেছি।
নিজের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছিল,
মনে হচ্ছিল, যা শুনছি হয় তো সবই সত্যি
সব সত্যি
যা কিছু শুনতে চাইছি।

(দূর থেকে স্টেশানের ইঞ্জিনের বাঁশীর শব্দ। একটা শব্দের পর আবার একটা বাঁশী।)

লোকটি

স্টেশানে ইঞ্জিন সিটি দিচ্ছে
যাচ্ছি যাব করছে।
কোনো প্রার্থনা ওকে থামাতে পারে না।
কোনো অনুনয় ওকে দেরী করাবে না।
সঙ্গ ভেঙে যাচ্ছে, কুসঙ্গও।
ছিনিয়ে নিয়ে যাবে
ছিঁড়ে নিয়ে যাবে
অনেক জোড় আজ ভেঙে যাবে।

(গাড়ী চলার শব্দ। লোকটি হাসে, হাসতে থাকে।)

লোকটি

চলে গেল।
গাড়ী চলে গেল।
বলে বলে, চীৎকার করে চলে গেল।
কারো কামনাকে তাড়িয়ে নিয়ে
গাড়ী চলে গেল।
যেখান থেকে ছেঁড়াখোঁড়া খবর আসে
এঁটো চিঠিতে।
যেখানে বুক খুলে
তল্লাশী নেওয়া হয়।
হৃদয়ের সব গোপন খবর
লাখবার পড়ে, লাখবার বেছে
তবে পাশ করে দেয়।
যেখানে প্রত্যেক মানুষের দাম
তার সহ্যশক্তির পাল্লায় মাপা হয়,
তার মৃত্যুর হিসেবে।
এখন সব ছেড়ে চলে গেছে
দূরে, বহুদূরে।

এখন ও কাঁদবে রাতভোর
তারাগুলো গুনে
ফুঁপিয়ে উঠবে
আধফোটা কুঁড়ি দেখে
যেগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে কেউ ওগুলো দেখাত ওকে।
দিত ওকে।
এখন ও খেতে আসবে
প্রতিবেশীরা পাশেই সব শুনবে।
প্রতিবেশী, যার অঙ্গনে
ছেড়া কাপড় শুকোচ্ছে,
কাগজ উড়ছে
হাওয়ায় কখনো খুলে যাচ্ছে জানালা
কখনো বা বন্ধ।
(মোটরের শব্দ বাড়ীতে এসে পৌঁছায়)

লোকটি

বাহ্।
আজ তো গাড়ীটা নিজেই
গ্যারেজে রাখতে গেল।
গ্যারেজের বাইরে গাড়ী রেখে
গ্যারেজের দরজা খুলছে।
আবার এসে গাড়ীতে বসলো।
গ্যারেজে ঢোকাল গাড়ী।
এবার গ্যারেজের ভারী দরজা
নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে বন্ধ করেছে।
এবার এদিকে আসছে।
সুখে আবিষ্ট হয়ে আছে কেমন।
যেন শরীরে রক্তের ভারও নেই।
চোখে চঞ্চলতা।

খোলা চুল।
হলুদ হয়েছে গাল।
লাল শুকনো ঠোঁট।
গুনে গুনে পা ফেলছে।
চিন্তান্বিত।
শোকাতুর।
কাঁপা হাত।
ও বাঁচতে পারে না।
(ঘাবড়ে গিয়ে)
ওহ্ পড়ে গেল?
বেঁচে গেছে।
পাথরের টুকরোতে ধাক্কা খেয়ে
কেমন ছটফটিয়ে উঠেছে।
ওর বাঁচা মুশকিল।
ও বাঁচবে না।
আমার সন্তানের মা মরে যাবে।
মরে যাবে?
রাজ মরে যাবে?
বিরহের আঘাতে শেষ হয়ে যাবে?
রাজী! তুমি প্রেম করেও
কি করে সর্বস্ব সমর্পণ করলে।
তোমার প্রেমিক চলে গেল।
তুমি ওকে এমন করে চাইতে?
তুমি বাঁচবে না?
তুমি মরে যাবে রাজী।
কাঁদতে কাঁদতে কষ্ট পেতে পেতে?
না! না!! না!!
তোমার সাথীর প্রয়োজন।
তোমার সমব্যথীর দরকার।

তোমার আত্মীয়ের প্রয়োজন।
তোমায় মরতে দিতে পারি না।
এ ঘর তোমার জন্যে খোলা,
এই ফুল তোমারই জন্যে ফুটে আছে।
(ফুলদানী থেকে ফুল ওঠাতে ওঠাতে)
তুমি এসো প্রিয়া, এসো।
পনেরো বছর তোমার সঙ্গে
একই ছাতের নীচে বাস করেছি
আমার থেকে বড় সাথী
আর কে হতে পারে বলো ?
আমার চেয়ে বড় সমব্যথী
আর কে আছে তোমার ?
আমার চেয়ে নিকট আত্মীয়
আর কে আছে।
(সিঁড়িতে স্ত্রীর পদশব্দ)
তুমি সিঁড়ি ভেঙে উঠেছো।
এসো, ওপরে এসো।
এসো, ওপরে চলে এসো।
(সামনে সিঁড়িতে পদশব্দ)
যেন সারা পৃথিবী সমস্ত জানালা
তুমি বন্ধ করে দিয়েছ।
আমি জীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নশেষে আলো দিতে পারি
পদ্মের পাতায় পাঁকের কয়েকটা ফোঁটা।
আমি তোমায় অনেক জলে ধুয়ে নেব।
তুমি এসো।
ওপরে এসো। এসো।
(সিড়িতে নিরন্তর মহিলার পদশব্দ।)

(যবনিকা)

ভুল দৃষ্টি

—অমরীক সিং

চরিত্র-লিপি

এস এল ছুজা : জেলার ডেপুটি কমিশনার
রামপ্রসাদ : ঐ অফিসে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট
সুষমা ছুজা : এস এল ছুজার স্ত্রী
অমরনাথ পুরী : হেড ক্লার্ক
চাপরাসী : ছুজার চাপরাসী

[একটি অফিসের সাজানো কামরা। পর্দা উঠতেই এস এল হুজা এবং রামপ্রসাদকে কথোপকথনে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। হুজার বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। অন্যের উপর বিশ্বাস রাখতে এবং প্রয়োজন মতো সাহায্য করতে চায় হুজা। রামপ্রসাদের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথার প্রায় সব চুলই সাদা। তার হাবভাবেও বিশ্বাসের ছাপ। দেখে মনে হয় অফিসের ফাইল নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই, ওগুলো যেন অন্যের ওপর হুকুম করার সামগ্রী মাত্র। ওর সম্বন্ধে প্রশংসা করতে গেলে বলতে হয় লোকটি খুব হুঁশিয়ার এবং সমালোচনা হিসেবে বলা যায় ভীষণ চালাক এবং সুযোগ সন্ধানী।]

হুজা : (চেয়ারে হেলান দিয়ে) না রামপ্রসাদবাবু, আমি তো এ আদেশে সই করতে পারবো না।

রামপ্রসাদ : স্যর, আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়।

হুজা : (টেবিলে ঝুঁকে) কে বললো কিছু নয়? প্রমোশন পাওয়া উচিত মনচন্দার আর তুমি প্রস্তাব করছ রামস্বরূপের নাম?

রামপ্রসাদ : আমার তো মনে হয় এ প্রমোশনের জন্যে রাম-স্বরূপই সবচেয়ে যোগ্য, তাই আমি ওর নাম সুপারিশ করেছি।

হুজা : কিন্তু মনচন্দার দোষটা কি? ওর নাম তুমি দিচ্ছ না কেন?

রামপ্রসাদ : ও তো আর দুবছর পরেই পেন্সন পেয়ে চলে যাবে। তাই...

হুজা : (একটু ভেবে) আশ্চর্য কথা। আচ্ছা, দুবছর পরে যখন রামস্বরূপের সুযোগ আসছেই তখন মনচন্দাকে কেন সুযোগটা দিচ্ছ না?

রামপ্রসাদ : আমার মনে হয়, দুবছর পর রামস্বরূপের যেটা প্রাপ্য হবে, সেটা ওকে এখনই দেওয়া উচিত।

হুজা : না না, এটা ঠিক হবে না। এভাবে মনচন্দার অধিকার

কেড়ে নেওয়া উচিত নয়। এ আমি কিছুতেই পারবো না।

রামপ্রসাদ : স্যর, অফিসে এটাও নিয়ম—যে লোক বেশী দিন চাকরী করবে তাকেই প্রমোশন দেওয়া হয়, কেননা সে নতুন কাজ শিখে অফিসেরই উন্নতি করবে।

হুজা : এ নিয়ম ঠিক নয়। আর নিয়মের কি আছে, আমরা এটা বদলাতে পারি। এটা কোনো ফাণ্ডামেণ্টাল রুল নাকি ?

রামপ্রসাদ : আপনিই মালিক। যা ভালো বোঝেন করুন। আমি শুধু নিয়মটা বল্লাম আপনাকে।

হুজা : (রামপ্রসাদের কাগজ ফেরৎ দিয়ে) আমার মনে হয় আপনি মনচন্দার নাম প্রস্তাব করুন।

রামপ্রসাদ : (আনমনে কাগজ উঠিয়ে) স্যর, এই প্রথম আপনি আমার প্রস্তাব শুনলেন না, নাকচ করলেন।

হুজা : আমারও এটা খুব খারাপ লাগছে।

(রামপ্রসাদ বাইরের দিকে দেখছে।)

হুজা : (চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে আসে) আমি সারারাত এ নিয়ে ভেবেছি। কাল সন্ধ্যায় তুমি যখন এটা পুট-আপ করলে আমি বলেছিলাম কাল সই করবো। এ ব্যাপারটা আমায় বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।

রামপ্রসাদ : (অসন্তুষ্ট হয়ে) স্যর, আমার খারাপ লাগছে এই ভেবে যে এক-দেড় বছরে আমি যতগুলো প্রস্তাব রেখেছি সব আপনি স্বীকার করেছেন, এই প্রথম এ ভাবে···

হুজা : (তুড়ি দিয়ে) কি এসে যায় এতে ? এ রকম তো হয়েই থাকে। দুজনের চিন্তা কখনো মেলে না।

রামপ্রসাদ : যথা আজ্ঞা আপনার। (মাথা নিচু করে প্রস্থান।)

হুজা : (পিছন থেকে) এতো দুঃখিত হবার কিছু নেই এতে।

রামপ্রসাদ : (ফিরে গম্ভীরভাবে) স্যর, এর মানে এই দাঁড়ায় যে আপনি ভাবছেন আমি রামস্বরূপের পক্ষপাতিত্ব করছি আর মনচন্দার বিরুদ্ধে রয়েছি।

হুজা : না না, কথাটা তা নয়। এ ছাড়াও আমার ধারণা এক

হতে পারে, আর তোমার অন্যরকম।

রামপ্রসাদ : কিছু মনে করবেন না স্যর, আপনি যাই বলুন আমার মনে হচ্ছে আপনার আমার ওপর বিশ্বাসটা আমি খোয়ালাম।

হুজা : তাই নাকি ? (সঙ্কেত করে) শোনো।

(রামপ্রসাদ হুজার কাছে আসে। দুজনেই চেয়ারে বসে।)

হুজা : আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও। প্রথম কথা, তুমি নিজে বিশ্বাস করো যে মনচন্দার কাজে অফিস পুরোপুরি সন্তুষ্ট ?

রামপ্রসাদ : হ্যাঁ।

হুজা : ওর যত নোটীং আমার কাছে এসেছে, সবই খুব চিন্তা করে লেখা। কোনো বাজে কথা নেই।

রামপ্রসাদ : হ্যাঁ, তা ঠিক।

হুজা : দ্বিতীয়ত: ওর রেকর্ড পুরো পরিষ্কার। কেউ কখনো ওর বিরুদ্ধে নালিশ করেনি, খারাপ রিমার্ক করেনি। বেইমান বলেনি কেউ।

রামপ্রসাদ : আজ্ঞে, তা মানছি।

হুজা : তৃতীয়তঃ, ও সবচেয়ে সিনিয়র। ওর সার্ভিসের আর মাত্র দুবছর বাকী আছে। তাহলে যাবার আগে ওকে শেষবারের মতো একটা লিফ্‌ট দিতে আপত্তি কিসের ?

রামপ্রসাদ : আজ্ঞে, না আপত্তির আর কি আছে ! আমি তো স্রেফ দপ্তরের রীতির কথা বলেছি। এরপর আপনি যা ভালো বোঝেন—আপনিই তো মালিক।

হুজা : (রাগত স্বরে) মালিক-ফালিক কোনো কথা নয়। তোমাকে কতবার বলেছি এ সব কথা আমার সম্বন্ধে বলবে না।

রামপ্রসাদ : ভুল হয়ে গেছে স্যর। (সলজ্জ) অভ্যেস হয়ে গেছে। মাফ চাইছি আমি।

হুজা (বিরক্ত) মাপ চাইবার কি আছে ? ছোটছোট ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নাও, আর বড় ব্যাপারগুলো নিয়ে কোনো চিন্তাই নেই। আমার কথা হল যখন এই তিনটে ব্যাপারেই মনচন্দার স্বপক্ষে তখন ওর প্রতি অন্যায় করার কি মানে ? এটা করছি বলে ভেব না যে ওর

সম্বন্ধে আমার কাছে সুপারিশ এসেছে বা কেউ ওর হয়ে বলেছে আমার কাছে।

রামপ্রসাদ : জানি স্যর।

হুজা : এমন কি ওকে আমি কখনো দেখিওনি। কিন্তু ওর কাজ আমার খুব পছন্দ। ফাইলে যখনই কিছু লিখে পাঠায় মনে হয় খুব বিচক্ষণ, দূরদর্শী লোক।

রামপ্রসাদ : (একটু ভরসা করে সাহস পেয়ে) এ কথাটা ঠিক বলেছেন স্যর। আমিও আমার যুক্তিটা বলছি আপনাকে। আমি আর মনচন্দা আজ নয়, গত পঁচিশ বছর ধরে প্রতিবেশী। বয়সে ও আমার চেয়ে ছবছরের বড়ো। কিন্তু অফিসে জয়েন করেছিলাম একই সঙ্গে। ও ছিল ম্যাট্রিক, আর আমি গ্র্যাজুয়েট। এই জন্যে ওর প্রমোশন হয়নি আর আমি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হয়েছি।

হুজা : আজ যখন সুযোগ আসছে তখন তোমার ওর পথে কাঁটা হওয়া উচিত নয়।

রামপ্রসাদ : আজ্ঞে, ওর উন্নতি হলে খুশীই হব। অবশ্য যদি সত্যি উন্নতি হয়।

হুজা : কেন হবে না ? তুমি ওর নাম প্রস্তাব করে নিয়ে এসো, আমি এক্ষুণি সই করে দিচ্ছি।

রামপ্রসাদ : অফিসের লোকেরা বলবে রামপ্রসাদ মনচন্দার প্রতিবেশী তায় আবার বন্ধু, সেই জন্যেই রামস্বরূপের অধিকার কেড়ে মনচন্দাকে সুযোগ করে দিচ্ছে।

হুজা : (একটু চীৎকার করে) অধিকার কেড়ে মানে ? অধিকার মনচন্দার না রামস্বরূপের ?

রামপ্রসাদ : স্যর, এ অফিসে এমনিই চলে।

হুজা : এই অফিসেই হয়, অন্য কোথাও হয় না। আমি অনেক জেলায় ঘুরে এসেছি—গুড়গাঁও, গুরুদাসপুর। কোথাও এমন নিয়ম দেখিনি।

রামপ্রসাদ : প্রথমে এখানেও হত না। আপনার শ্বশুর মশাই এটা শুরু করেছিলেন। রায়বাহাদুর যেখানে যেখানে ছিলেন সেখানেই

এমনি নিয়ম চালু করছেন। আমার প্রমোশনও এমনি ভাবেই হয়েছিল।

হুজা : (মুচকি হাসে) তোমাকে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বানানোর জন্যেই এ নিয়ম চালু করেননি তো উনি ?

রামপ্রসাদ : না না। আমার আগে ভার্মার লাভ হয়েছিল, ও তাড়াতাড়ি হয়েছিল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। পরে আমার নম্বর এলো।

হুজা : (রামপ্রসাদের অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে মজা পেয়ে) আমার মনে হয় তোমার কথা ভেবেই রায়বাহাদুর এ নিয়ম শুরু করেন।

রামপ্রসাদ : না স্যর। তখন তো আমি অনেক জুনিয়ার। আপনি মা-জননীকে জিজ্ঞেস করবেন।

হুজা : (হাসি হাসি মুখ) হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞেস করতে হবে।

রামপ্রসাদ : সত্যি, জিজ্ঞেস করে দেখবেন স্যর।

হুজা : (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) আমি যদি এ নিয়ম বদলে দিই তা হলে কেমন হয় ?

রামপ্রসাদ : (ঘাবড়ে গিয়ে) অনেক ক্ষতি হবে স্যর।

হুজা : কেন, ক্ষতি কিসের ?

রামপ্রসাদ : যদি মনচন্দার প্রমোশন হয় তা হলে দু বছর পরে রামস্বরূপের চান্স আসবে না। ওর রিটায়ার করতে দু বছর বাকী থেকে যাবে।

হুজা : এখন বুঝতে পারছি। তুমি চেষ্টা করছ যাতে রামস্বরূপের উন্নতি কোনো ভাবেই না আটকায়। মনচন্দার ক্ষতি হলেও কিছু এসে যায় না। (রেগে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে) আমি এ অন্যায় হতে দেব না। অধিকার মনচন্দার, আর তা পাবে রামস্বরূপ ? তোমার সঙ্গে মনচন্দার যে কি বন্ধুত্ব সেটা বুঝতে পারছি। আবার বলছো গত পঁচিশ বছর ধরে ও তোমার পড়শী।

রামপ্রসাদ : স্যর, আপনি ভুল বুঝছেন। আমি কারুর কোলে ঝোল টানছি না। আমি স্রেফ পুরানো নিয়ম বাঁচিয়ে চলছিলাম।

হুজা : (রাগত স্বরে) যুক্তি দেখাবার চেষ্টা কোরো না। কাল সন্ধ্যে থেকে ঐ এক কথা শুনে আসছি। আমাদের অফিসে এই

নিয়ম। অমুক সিনিয়র, অমুক জুনিয়র। ওর দুবছর বাকী, তার চার বছর। অফিসে চলছেটা কি ? সব অন্ধ হয়ে গেছে, না যথেচ্ছাচার ?

রামপ্রসাদ : (ভয় পেয়ে) স্যর, ভুল করছেন আপনি। আমি তা ঠিক বলতে চাইনি।

হুজা : কি বলতে চাওনি। কাল সন্ধ্যে থেকে এ নিয়ে চিন্তার শেষ নেই। তুমি হাজার যুক্তি দেখালেও বুঝে গেছি ব্যাপারটা কি।

রামপ্রসাদ : (বিশ্বাসী ভঙ্গিতে) স্যর, আপনি ভাবছেন রামস্বরূপ আমার বন্ধু তাই আমি ওকে ফেভার করতে চাইছি।

হুজা : (গর্জন করে) হ্যাঁ, তাই ভাবছি। বাকী সব বাহানা। এটা প্রমাণ করার জন্যেই যুক্তি দেখাচ্ছ হাজার রকমের।

রামপ্রসাদ : (সম্পূর্ণ বিশ্বাসীভাবে) স্যর আপনার এ কথা ঠিক হতো যদি আমি অফিসের নিয়ম ভাঙতে যেতাম। আমি তো...

হুজা : আজ যখন অফিসের অনিয়ম বন্ধ করতে যাচ্ছি তুমি রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করছ, কারণ এটা হলে তোমার বন্ধু রামস্বরূপের ক্ষতি হয়।

রামপ্রসাদ : আপনি মালিক। যা খুশী ভাবুন, আমার আর কি করার আছে। অবশ্য এটা আমি বলবই যে আপনি ব্যাপারটা ভুল বুঝেছেন।

হুজা : কিছু ভুল বুঝিনি, বরঞ্চ ভুলটা দূর হচ্ছে এখন।

রামপ্রসাদ : (ধীর স্বরে) ভুল দূর হয়ে গেছে।

হুজা : আগে তোমরা যা লিখে আনতে আমি চটপট সই করে দিতাম। কারণ, ভাবতাম যে যা লিখেছ ঠিকই লিখেছ। আজ বুঝতে পারছি এটা করা আমার উচিত হয়নি।

(হুজার স্ত্রী সুষমার প্রবেশ। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বছর, সুন্দর শাড়ীতে সুন্দর মানিয়েছে। চেহারায় ছেলেমানুষীর ভাব, একটু আদুরেপনা আছে।)

সুষমা : হ্যালো ডার্লিং, ভালই হলো, তুমি একেবারে তৈরীই আছ। (একটু ন্যাকামীর স্বরে) ব্যাস, আধ ঘণ্টার জন্যে আমার সঙ্গে একটু ক্লাবে চলো, স্রেফ আধ ঘণ্টা। (হুজার চোখে চমক লক্ষ্য করে)

প্রমিস, এর বেশী সময় নেব না।

হুজা : দেখ লক্ষ্মীটি, এখান থেকে এখন আধ ঘণ্টার জন্যে যাওয়াও সম্ভব নয়। আমার দু-একটা খুব জরুরী কাজ আছে।

রামপ্রসাদ : (সুষমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে) নমস্কার মা-জননী।

সুষমা : (স্বামীর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে) ওহ্—বাবুজী। বলুন, কি খবর আপনার ?

রামপ্রসাদ : (নম্র স্বরে) আজ্ঞে, আপনাদের দয়ায় ভালই আছি।

সুষমা : (পুরানো স্বরে) তোমার তো সব সময় খালি কাজ। আধ ঘণ্টাও সময় হবে না ?

হুজা : প্রশ্নটা আধ ঘণ্টার নয়, প্রশ্নটা অ্যাটিচুডের। তোমার কোনো কাজ নেই, আর আমার এতো কাজ যে শেষই হয় না। কিন্তু, এখন কি ক্লাবে যাওয়ার সময় নাকি ? সন্ধ্যেবেলায় একসঙ্গে যাবো'খন।

সুষমা : ওখানে মিসেস নিগেসকে ডেকেছি। তুমি থাকলে ভালো হতো, কতগুলো ব্যাপারে তোমারও মতামত নেওয়ার ছিলো।

হুজা : (রামপ্রসাদকে) ঠিক আছে, একটু পরেই তোমায় ডাকছি। তুমি ততক্ষণে প্রস্তাবটা নতুন ভাবে লিখে নাও।

রামপ্রসাদ : (লজ্জিত ভাবে) আপনি যদি মনচন্দাকে হেড ক্লার্ক করতে চান, তা হলে আপনার নিজের হাতে আদেশটা রেকর্ড করলেই ভালো হয়।

হুজা : না, এ প্রস্তাব তো তোমার দিক থেকেই আসা উচিত।

রামপ্রসাদ : (সভয়ে কিন্তু বাধ্য হয়ে) আমায় মাপ করবেন, আপনি তো...

হুজা : (রাগ চেপে টেবিলের উপর থেকে কাগজ তুলে) এ প্রস্তাব তোমার দিক থেকে আসা উচিত। রেকর্ডে থাকা ঠিক নয় যে তোমার প্রস্তাব আমি নাকচ করে দিয়েছি।

রামপ্রসাদ : (কাগজ নিয়ে) আচ্ছা, নমস্কার মা-জননী।

সুষমা : নমস্কার। সরোজিনী ভালো তো ? চিঠি-পত্তর আসেনি কিছু ?

রামপ্রসাদ : (একটু সাহস পেয়ে) এই পরশুই চিঠি পেলাম। ওহ্ ভুলে গিয়েছিলাম বলতে আপনাকে ও নমস্কার জানিয়েছে।

সুষমা : আমারও নমস্কার জানাবেন ওকে।

রামপ্রসাদ : (প্রস্থানোদ্যত) দীর্ঘায়ু হও মা। (প্রস্থান)

হুজা : খুব ঘাঘু লোক। মনের মধ্যে কি আছে কে জানে?

সুষমা : আমি তো প্রথমেই বলেছি। তুমিই তো বিশ্বাস করতে না।

হুজা : আমি তো ভাবতেই পারিনি যে ও এসব চাল চালতে পারে।

সুষমা : (মন দিয়ে শোনে) কেন কি হয়েছে?

হুজা : কাল থেকে আমার ঘুম নষ্ট করেছে লোকটা। রাতভোর এই নিয়ে ভেবেছি, ভেবেছি কি করে সমস্যার সমাধান করা যায়।

সুষমা : (একটু চিন্তিত) কিন্তু, কি হয়েছেটা কি?

হুজা : পুরী, আমার হেড ক্লার্ক সামনের মাসে রিটায়ার করছে। ওর জায়গায় যার আসা উচিত এ তার নাম প্রস্তাব তো করছেই না, উল্টে অন্য একজনের জন্যে চাপ দিচ্ছে।

সুষমা : তাতে কি? ওর কথা শুনো না। এইটুকু ব্যাপার নিয়ে এতো চিন্তা করছো কেন? চলো, ছাড়ো তো এসব, গাড়ীতে বসে না হয় ভেবে নিও। কি এমন রাজ্য উল্টে যাচ্ছে?

হুজা : (সমস্যাটা হালকা করে দেখায় অপছন্দ করে) তোমার তো সব সময় ছেলেমানুষের মতো কথা। আচ্ছা, এ সময়ে ক্লাবে গিয়ে আমার হবেটা কি বলো তো?

সুষমা : আমি বলছি—সেটা কিছু নয় বুঝি?

হুজা : কিন্তু ওখানে কি আছে কি ব্যাপারটা? এই দেখ ফাইলের কি পাহাড় জমেছে। কত কাজ পড়ে রয়েছে। আবার লোকদের সঙ্গে দেখা করার সময়ও হয়ে এলো বলে।

সুষমা : (সপ্রেম) না লক্ষ্মীটি। আমার সঙ্গে চলো। প্লীজ।

হুজা : কিন্তু আমি কি করবো কি ওখানে? তুমি তো মিসেস নিগেসের সঙ্গে কথা বলবে, আর আমি?

সুষমা : তোমাকেই তো দরকার। তোমায় ছাড়া কথাই হবে না।

হুজা : (বিরক্ত হলেও বিরক্তিভাব চেপে) বুঝতে পারছি না আমাকে ওখানে দরকারটা কিসের ?

সুষমা : ব্যাপারটা হলো আমি আর মিসেস নিগেস মিলে ক্লাবে লেডীস ফেয়ার করতে চাই। তাতে তোমার সাহায্যও দরকার।

হুজা : যা দরকার লাগবে, সব পাবে। এতে আর জিজ্ঞেস করার কি আছে।

সুষমা : জিজ্ঞেস করার কথা আছে বলেই তো তোমায় যেতে বলছি। নয় তো অকারণে তোমাকে বিরক্ত করার কি মানে। (একটু রেগে গিয়ে) তুমি আমাকে কি ভাবো বলো তো ?

হুজা : (হালকা স্বরে) মজাটা পুরো তুলতে হবে তো ?

সুষমা : (আর একটু উষ্ণ) ঐ এক কথা আবার। ঠিক আছে, আমার আসা যদি তোমার এতই অপছন্দ হয় তা হলে আমি চলে যাচ্ছি।

হুজা (স্বর পরিবর্তন করে) ব্যস, অমনি চটে গেলে—বাচ্চাদের মতো একেবারে। আচ্ছা শুনি তো কি সমস্যাটা ওখানে ?

সুষমা : (রাগত স্বরে) কিছু সমস্যা নয়। ঠিক করে কথা বলতে হয় তো বলো, নয় তো যাচ্ছি আমি।

হুজা : (সুষমার হাত ধরে) বোসো, চেয়ারে বোসো। বলো, কি ব্যাপার।

সুষমা : (বসতে নারাজ) আচ্ছা বলো তো, তুমি ক্লাব পর্যন্তও যেতে পারবে না।

হুজা : (দৃঢ় স্বরে) না।

সুষমা : (একটুক্ষণ নীরব থেকে, চিন্তা করে) কথাটা হলো, মিসেস পৌরাণিকও মহিলাদের জন্যে এমনি মেলা করতে চাইছে। কিন্তু আমি আর মিসেস নিগেস ঠিক করেছি আমরা তার আগেই করবো।

হুজা : (অন্যমনস্কভাবে) করো, কি অসুবিধে তাতে ?

সুষমা : না, এদিকে যদি বিগ্রেড হেডকোয়ার্টারের সাহায্যে মেলা

হয়ে যায় তা হলে আমরা হাঁ করে থাকব এর ওর মুখের দিকে চেয়ে।

হুজা : (কথা শুনতে না চেয়ে) কি যে বলছ তুমি। আমি ক্লাবের এক্সিকিউটিভ মিটিঙে পাশ করিয়ে নের যে মিসেস হুজার প্রস্তাব প্রথম এসেছিল, সেই জন্যে লেডীস ফেয়ার ওকেই করতে দিতে হবে। এতো সামান্য কথা ; তা হলে আজ সন্ধ্যে বেলায়েই একটা দরখাস্ত দিয়ে দিও।

সুষমা : পরে আবার তুমিই বলবে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হিংসে করে আর আমাদের সম্পর্ক খারাপ করায়।

হুজা : (সান্ত্বনা দিয়ে) আচ্ছা, বলবো না মাই ডিয়ার।

সুষমা : এও বলো যে এইভাবে সিভিল আর মিলিটারীদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়।

হুজা : (সব সমস্যা সমাধানের ভঙ্গিতে) কিছু হবে না, তুমি যা চাও করো। আমি না হয় চিরকাল সামনে কথা বলবো।

সুষমা : ঠিক আছে, ক্লাবে তবে একাই যাচ্ছি। সব কথা মিসেস নিগেস আর আমি ঠিক করে নেব।

হুজা : দাঁড়াও, এক্ষুণি যেও না। আমার সমস্যাটারও সমাধান করে যাও।

সুষমা : কি ?

হুজা : কি ? আমি সমস্যায় ডুবে আছি, আর জিজ্ঞেস করছ, কি ?

সুষমা : আবার বলো।

হুজা : তোমাকে বলছি না যে ঐ রামপ্রসাদ চালাকি করে নিজের বন্ধুকে হেড ক্লার্ক বানাবার তালে আছে।

সুষমা : (অবুঝের মতো) তো করে দাও তুমি।

হুজা : অত সোজা নয়। আর ওকে নাই বা করব কি করে ?

সুষমা : আমি তো তোমায় প্রথমেই বলেছি রামপ্রসাদের সব কথা শুনো না। লোকটা ভীষণ ইয়ে। বাবাও ওকে বিশ্বাস করে খুব আপশোষ করতেন পরে।

হুজা : ওকে চাকরীতে তো উনিই ঢুকিয়েছিলেন।

সুষমা : একেবারে বিরক্ত করে মেরেছিলো। অবশ্য দু-তিন মাস

পরেই আমরা বদলী হয়ে গিয়েছিলাম।

হুজা : এতদিন ওর সব কথা মেনেছি, এবার মন মানতে চাইছে না।

সুষমা : বলে দাও ওকে। চিন্তার কি আছে। মক্কার আটা এনে দিয়েছে, বাঁশমতী চাল এনে দিয়েছে—তা বলে কি একেবারে বশ করে নিয়েছে নাকি ?

হুজা : তোমার কাছে এসে উল্টোপাল্টে বকবে।

সুষমা : বলবে তো বলবে! আমার তো কোনদিনই পছন্দ নয়। বাবার সময় ভর্তি হওয়া লোক, আবার ওর মেয়ে সরোজিনীও আমার বন্ধু ছিলো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে---

হুজা : ও তো সবাইকে ঐ কথাই বলে—সাহেবের বউ আমার মেয়ের বন্ধু। এই জন্য আমি যা চাই সাহেবকে দিয়ে করিয়ে নিই।

সুষমা : আমি তোমায় হাজার বার বলেছি রামপ্রসাদের সব কথা শুনো না। ছোটবেলা থেকেই ওকে ঘাঘু, চালু লোক মনে হত। আগে সরোজিনীর কাছে যখন যেতাম আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করতো। একবার বলে কি—'রায়বাহাদুর সাহেব বলেছে তোমার উপর নজর রাখতে'। এই জন্যেই ভালো লাগে না ওকে। (একটু চুপ করে) কিন্তু কে জানে কেন তুমি ওর সব কথা মেনে নাও।

হুজা : দুদিকেই মুশকিল। মানলেও মুশকিল, না মানলেও মুশকিল।

সুষমা : না মানলে কি হবে? ও তোমার কি করতে পারে?

হুজা : তোমার শেঠ রামদয়ালের ব্যাপারটা মনে আছে!

সুষমা : হ্যাঁ।

হুজা : আমি পরে জেনেছি যে ও রামপ্রসাদের সম্বন্ধী।

সুষমা : তাতে কি ?

হুজা : তার মানে রামপ্রসাদ নিশ্চয়ই জেনে গেছে যে আমি ওর কাজ করে দিয়েছি, তাই।

সুষমা : তা হলে তো নিশ্চয়ই জেনে গেছে।

হুজা : আমি রামপ্রসাদের সব কথা মেনে নিই যাতে ও আমার বিরুদ্ধে কিছু বলার সুযোগ না পায়।

সুষমা : (সব যেন নতুন দৃষ্টিতে দেখছে) কিন্তু এ সব এমনি কত দিন চলবে ?

হুজা : এখন পর্যন্ত তো চলছে।

সুষমা : (কথার খেই ধরে) তা হলে চালাতেই থাকো।

হুজা : কিন্তু এই কেসটায় আমার মন মানছে না।

সুষমা : কেন ?

হুজা : মনচন্দা সবচেয়ে সিনিয়ার, ওর কাজও সন্তোষজনক। দুবছর পরেই রিটায়ার করবে। কি ক্ষতিটা হয় যদি ও দুবছরের জন্যে হেড ক্লার্ক হয়ে যায়। কিছু না হলেও ওর পেনসানেই প্রতিমাসে পনেরো-কুড়ি টাকার তফাৎ হবে।

সুষমা : সে তো ঠিকই কথা।

হুজা : রামপ্রসাদ নিজের বন্ধুর উপকার করতে চায়।

সুষমা : (চিন্তিত) তুমি ওর কথা না মানলে কি হবে ?

হুজা : কি হবে ? হয় তো রামপ্রসাদ কিছু বানিয়ে বলবে।

সুষমা : তোমার কি আবার কিছু নেওয়ার আছে যে ওর বলা-কওয়ায় এসে যাবে তোমার।

হুজা : এই জন্যে বলেছিলাম যে আমার যে সম্মান, রেপুটেশান রয়েছে সেটা তো রাখতে হবে, তা নষ্ট করা চলবে না।

সুষমা : তা হলে ভেবে দেখো।

হুজা : কাল থেকে তো এই ভাবছি, কি আর করার আছে।

সুষমা : ঘাবড়াবার কিছু নেই। ভালো করে ভাবলে কিছু না কিছু রাস্তা বেরোবেই।

হুজা : আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। উপদেশ দিতে শুরু করেছ এবার।

সুষমা : আচ্ছা তুমিই বলো কবে জানলে রামদয়াল রামপ্রসাদের সম্বন্ধী।

হুজা : জেনেছি তো কয়েক মাস আগেই, তোমায় বলিনি।

সুষমা : কেন, আমাকে বললে কি ক্ষতি হতো ?

হুজা : এমনই, ভাবছিলাম তুমি অকারণ চিন্তা করবে। ছাড়ো,

কি আর হবে।

সুষমা : এত জরুরী কথা, আমাকে অন্তত বলা উচিত ছিল। কিন্তু, তুমি জানলে কি করে ?

হুজা : হেড ক্লার্ক পুরীর কাছ থেকে।

সুষমা : কি করে ?

হুজা : শেঠ রামদয়ালের পেপারস্ আমার কাছে এসেছিল। পুরী আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। ওই বলল, স্যর, এই শেঠ আমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সম্বন্ধী হন।

সুষমা : তার মানে বেশ নিকট সম্বন্ধ।

হুজা : (সুষমার চিন্তায় না খেয়াল করে) আমি কথাটা ইগ্নোর করলাম। ও আবার বলল ঐ এক কথা। আমি বললাম, 'তাতে কি হয়েছে'। ও তখন বলল, 'না কিছু না। হয় তো সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট সাহেব নিজের সম্বন্ধীর সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু বলতে পারবেন না। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

সুষমা : তুমি কি বললে ?

হুজা : আমি বললাম, 'তাতে আমার কি ? যদি সব ঠিক থাকে নিজে নিজেই সব হয়ে যাবে।'

সুষমা : তার মানে ? ও জানে নাকি যে তুমি রামদয়ালের থেকে কিছু—

হুজা : হয় তো হতেও পারে রামপ্রসাদ ওকে শিখিয়েছে আমাকে বাজিয়ে দেখতে কেমন—

সুষমা : রামপ্রসাদ ঘুঘু লোক। হয় তো ও তোমাকে বোঝাতে চাইছে যে তোমার আর শেঠ রামদয়ালের সব কথাই ও জানে।

হুজা : যাই হোক। শেঠের সাহায্য নিয়ে যে গাড়ী নেওয়ার ছিলো, নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আর আমাদের কোনো কিছুর দরকার নেই। দাঁড়াও। একটা বুদ্ধি এসেছে। এক কাজ করি। (ঘন্টি বাজায়। চাপরাসীর প্রবেশ) হেড ক্লার্ককে ডেকে দাও তো। (চাপরাসীর প্রস্থান)

সুষমা : কি করছ কি ?

হুজা : হেড ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করব কি করা উচিত।

সুষমা : ও বুদ্ধি বাৎলাবে নাকি? (পুরো ব্যাপারের দুর্বলতাটা বুঝে) আমার মনে হয়, রামপ্রসাদ যা বলে তাই করো।
(বাইরে থেকে হেড ক্লার্ক পুরীর প্রবেশ। বয়স পঞ্চান্ন বছর। অফিসে দীর্ঘদিন রগড়ানো চেহারা। বহু বছর চেয়ারে বসে বসে কুঁজো হয়ে গেছে। যতক্ষণ সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ততক্ষণ কোমরে হাত, যেন নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করছে।)

হুজা : আসুন।

পুরী : নমস্কার।

সুষমা : নমস্কার।

হুজা : পুরী সাব, বলুন তো অফিসে প্রমোশনের নিয়মটা কি?

পুরী : মানে, স্যর, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

হুজা : মানে, সামনের মাস থেকে তো আপনি রিটায়ার করছেন। এবার আপনার জায়গায় কার টার্ন আসবে।

পুরী : আজ্ঞে আমাদের অফিসের রীতি পরের লোকের চাকরী যদি দুবছরের কম বাকী থাকে তা হলে তাকে চান্স দেওয়া হয় না। তার পরের জন চান্স পায়।

(হুজা স্ত্রীর দিকে দেখে। সুষমা নিশ্চল বসে)

হুজা : (কথাটাকে স্পষ্ট করার জন্যে) এখন টার্ন মনচন্দার না রামস্বরূপের।

পুরী : মনচন্দার এখনো সওয়া দুবছর বাকী আছে স্যর। কিন্তু আমার মনে হয় চান্স রামস্বরূপেরই পাওয়া উচিত।

হুজা : বাহ্, তা কেন? যখন মনচন্দার সার্ভিস এখনও সওয়া দুবছর বাকী রয়েছে তখন রামস্বরূপের কেন চান্স হবে?

পুরী : আমার মনে হয় স্যর, রামস্বরূপেরই হওয়া উচিত। মনচন্দার দুয়ের জায়গায় সওয়া দুবছর রয়েছে, তিন মাসের তফাৎ কি আর তফাৎ থাকে।

হুজা : কেন? তিন মাসের তফাৎ কিছু নয়? যদি আপনাকে তিন মাস আগে রিটায়ার করিয়ে দেওয়া যায় তা হলে কি আপনি মেনে নেবেন?

পুরী : সেটা অন্য কথা স্যর।

হুজা : (একটু চটে গিয়ে) নিজের জন্যে অন্য কথা। আপনারা সব নিজেদের মধ্যে ঘোঁট পাকাচ্ছেন। রামস্বরূপ আর আপনি। এই রামস্বরূপটাকে কেন যে আপনাদের দলে রেখেছে ?

পুরী : (নম্রভাবে) না স্যর, তেমন কিছু নয়।

হুজা : (উত্তেজিত) কিছু না। আপনারা সবাই এক। কে জানে মনচন্দার বিরুদ্ধে কিসের আপনাদের অভিযোগ ? ওকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে চান না। কি দোষ ওর ? ও সবচেয়ে কাজের লোক। কি দোষ আছে ওর, বলুন !

পুরী : (ভয়ে জড়সড়ো) আমি তো কিছু বলিনি স্যর। শুধু অফিসের নিয়মটাই বলছিলাম। বাকী তো আপনিই মালিক স্যর।

হুজা : আমি কোনো বাজে কথা শুনতে চাই না। (রাগতস্বরে) আমি যা ভাল বুঝবো করবো। আপনাদের নিয়মের আমি কোনো পরোয়া করি না। কাল থেকে এই ঝামেলা আমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছে। এই অফিসের এই নিয়ম। ওর দুবছর, তার সোয়া দুবছর, উহ।

পুরী : মাপ করবেন স্যর। আপনি নিশ্চয়ই কিছু ভুল বুঝেছেন। আমি নিবেদন করছিলাম—

হুজা : (বাধা দিয়ে) আমার সত্যি দুঃখ লাগছে মিস্টার পুরী। রিটায়ার করার সময়ও নিজের অধিকারটা চিনলেন না। অন্তত যাওয়ার সময়তো এসব অভ্যেসগুলো ছেড়ে যান।

পুরী : আজ্ঞে, আমায় যদি খুলে বলতে দেন তো আমি—

হুজা : ঠিক আছে পরে বলবেন। আমি মনোস্থির করে নিয়েছি। আপনি গিয়ে মিস্টার মনচন্দা আর মিস্টার রামপ্রসাদকে পাঠিয়ে দিন। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নেব দুজনের মধ্যে কে ঠিক। (এই বলে সুষমার দিকে তাকায় যেন জানতে চায় ঠিক বলেছে কিনা। ও নীচে তাকিয়ে ছিল তাই ওর দিকে দেখেনি।)

পুরী : (ঘাবড়ে গিয়ে) কিন্তু, মনচন্দা তো আজ ছুটীতে আছে স্যর।

হুজা : ছুটীতে ? কই আমার কাছে তো ওর দরখাস্ত আসেনি ?

পুরী ঃ (আরো ঘাবড়ে গিয়ে) তিন দিন পর্যন্ত ছুটী দেবার অধিকার তো আপনি সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে দিয়েছেন স্যর।

হুজা : (মনে পড়ে) ওহ্, তাই তো। এই অকম্মা রামপ্রসাদ··· (কি ভেবে) ঠিক আছে, রামপ্রসাদকেই পাঠিয়ে দিন।

পুরী ঃ (উঠে পড়ে) নমস্কার। (প্রস্থান)

সুষমা : নমস্কার। (প্রস্থানের পর) কি করবে কি ?

হুজা ঃ আমি রামপ্রসাদের প্রস্তাব মানব না ঠিক করেছি। ওকে আগেই বলে দিয়েছি নতুন করে লিখে নিয়ে আসতে ?

সুষমা ঃ (চিন্তিত স্বরে) ভেবে দেখ—এখুনি বলছিলে কি ঠিক করবে যাতে ও...

হুজা ঃ (তাড়াহুড়োয়) যা খুশী বলছে। কতক্ষণ আর এই নিয়ে চিন্তা করা যায়।

সুষমা : (এখনও চিন্তিত স্বর) এখনি এক কথা বললে, আবার অন্য কি বলছ ?

হুজা ঃ (আশ্বস্ত হয়ে) এমনিই হয়। এই ব্যাপারে স্ট্যাণ্ড না নিলে রামপ্রসাদ দিনে দিনে মাথায় চড়ে বসবে। এই জন্যে দরকার...

(রামপ্রসাদের প্রবেশ)

হুজা : (রামপ্রসাদকে দেখে) নতুন প্রস্তাব লিখে এনেছ ?

রামপ্রসাদ : না স্যর।

হুজা : কেনো ?

রামপ্রসাদ : মনে হয়, এ ব্যাপারে আর একটু ভেবে দেখলে ভালো হয়।·(হুজাকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে) এতে আর কি এসে যাবে ?

হুজা : বেশী ভাববার কোনো দরকার নেই। আমি সব ভেবে দেখে নিয়েছি।

রামপ্রসাদ ঃ আমার মনে হয় তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই।

সুষমা : ঠিক আছে, আর একটু ভেবে নাও।

হুজা : এই ব্যাপারটা কাল থেকে আমার মাথায় চেপেছে। যতক্ষণ না ফয়সলা হচ্ছে ততক্ষণ শান্তি পাচ্ছি না।

সুষমা : ডার্লিং, কাল ফয়সলা করে নিও। আজ আর কালের

মধ্যে আর কিসের তফাৎ।

হুজা : একদিনের তফাৎ। আমার জন্যে তো একমিনিটও এখন অনেক। (রামপ্রসাদকে) নিয়ে এসো, আমি এখনি ফাইলে লিখে দিচ্ছি যে পুরীর পর মনচন্দাকে হেড ক্লার্ক করা হোক।

রামপ্রসাদ : স্যর, আপনি আমার কথা শুনছেন না। এখনি করলে অফিসে হৈহৈ পড়ে যাবে।

হুজা : কোনো কথা নয়। আমি এ অন্যায় দেখতে পারবো না—অধিকার মনচন্দার আর তা পাবে রামস্বরূপ—আশ্চর্য।

রামপ্রসাদ : স্যর, অফিসের নিয়মনীতি মেনে চলাই ভাল। নয়ত অন্য যারা আশা করে বসে আছে তাদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দেবে।

হুজা : (অধৈর্য হয়ে) সব ভেবে দেখেছি। এদিকে দাও নোটিংটা। (রামপ্রসাদ ফাইলটা এগিয়ে দেয়। হুজা তাতে লিখতে থাকতে। রামপ্রসাদ সুষমার দিকে দেখে। ফাইলে লিখে সেটা রামপ্রসাদকে এগিয়ে দেয় হুজা। নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলে।)

রামপ্রসাদ : স্যর, আপনি খুশী হলে আমিও খুশী।

হুজা : এবার যা খুশী বলো, সব শুনতে রাজী আছি।

রামপ্রসাদ : তাহলে শুনুন স্যর। মনচন্দা গত তিন বছর ধরে অন্ধ। একবার ওর সাইকেল মোটরের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। প্রাণে বেঁচে গেলেও, চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকগুলো ছেলেপিলে সার্ভিসেরও আর পাঁচ বছর বাকী ছিল। তাই আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছিলাম যে সবাই ওর কাজ করে ওকে দিয়ে সইটা করিয়ে নেব।

হুজা : (চোখে মুখে এক ছায়া পড়ে) কি বলছো তুমি? ওর সইকরা যে ফাইলগুলো আমার কাছে আসে, সেগুলোয় শুধু ওর সই-ই আছে?

রামপ্রসাদ : হ্যাঁ, তাই স্যর। ও অফিসে এক কোণে লুকিয়ে বসে থাকে, ওর কাজ সব আমরাই করে দিই।

হুজা : সুষমা, শুনলে!

সুষমা : আমি তো শুনে শুনে হায়রান হয়ে গেলাম।

রামপ্রসাদ : (বলতে আর বাধা নেই তেমন স্যর) শুধু এই নয়।

দুবছর পর ওর ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করে যাবে। মনচন্দা রিটায়ার হয়ে গেলে আমরা ওর ছেলেকে চেষ্টা চরিত্র করে ঢুকিয়ে নেব চাকরীতে, তাতে ওদের সংসারটা বেঁচে যাবে।

হুজা : তুমি এসব আগে বলনি কেন ? এত বড় একটা কথা ?

রামপ্রসাদ : কি করে বলবো স্যর, কে জানে আপনি কি করবেন। যদি আগে বলতাম তাহলে আপনি হয়ত বলতেন একে চাকরীতে রাখাই উচিত নয়।

হুজা : (নম্র স্বরে) হ্যাঁ, হয়ত তাই বলতাম।

রামপ্রসাদ : (পুরানো কথার খেই ধরে) মনচন্দাকে হেড ক্লার্ক করলে অফিস চলত কি করে ?

হুজা : আশ্চর্য কথা ?

রামপ্রসাদ : (কাগজটা নিয়ে) স্যর, আপনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন রামপ্রসাদটা ভীষণ বেইমান। তাতে কি ? ভুল তো হয়াই স্বাভাবিক। সেই কথা আছে না, চোখে বালি পড়লে সূর্যও ঢাকা পড়ে যায়।

(হুজা সুষমার দিকে তাকায়। রামপ্রসাদ কাগজটা উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। পর্দা।)

গোমুখী ব্যাঘ্রমুখী

—গুরচরণ সিং জস্সুজা

চরিত্র-লিপি

কিশন দেবী
শরণ সিং
চোপড়া সাহেব
সুদর্শন

প্রথম দৃশ্য

(বাজারের পথ)

[চোপড়া সাহেব আর শরণ সিং বাজারে কথা বলতে বলতে আসছে। একটু এগিয়ে একধারে গিয়ে কথা বলতে থাকে। চোপড়া বয়সে প্রৌঢ়—পরনে প্যাণ্ট, হাতে হ্যাট। শরণ সিং শিখ—বড়ো দাড়ি, সাধারণ কাপড় আর ময়লা পাগড়ী পরে। কামিজ খোলা, পায়জামা পরে।]

চোপড়া : আপনি সত্যি জোরদার লোক সর্দার সাহেব। টানতে টানতে এতদূর নিয়ে এসেছেন আমাকে।

শরণ : ব্যস চোপড়া সাহেব, পৌঁছে তো গেলেন আপনি। এই বাজারেই তো ঐ বাড়ীটা। (আঙুল তুলে দেখায়) ঐ যে গলিটা দেখছেন, ওর ঐ কোণের বাড়ীটা ছেড়ে ঠিক পরেরটাই।

চোপড়া : হ্যাঁ, বাড়ী তো হলো। কিন্তু আমি বলছিলাম—

শরণ : (না-শোনার ভান করে) ঐ দেখুন, যেটার সবুজ রঙের বারান্দা মতন, গলির দিকে দুটো জানলা। বারান্দায় দাঁড়ালে সুন্দর হাওয়া আসে।

চোপড়া : আপনি দারুণ ইয়ে হচ্ছেন। আমি বলছিলাম সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নেওয়ার এখন উপায় নেই। নিতান্ত টানা-হ্যাঁচড়া করলেন তাই আসতে হলো।

শরণ : চোপড়া সাহেব, বিশ্বাস করুন আমার ঐ কমিশনের কোনো লোভ নেই। আপনাকে নিতান্ত ভালবাসি। আমার অন্য সব খদ্দেরও তো রয়েছে, কিন্তু এটা একটা ভাল দাঁও, তাই সবাইকে বলতে চাই না।

চোপড়া : অনেক ধন্যবাদ সর্দার সাহেব। কিন্তু আসল কথা এখন কেনার উপায় নেই আমার।

শরণ : এ কথা ছাড়ুন, সব জানি আমি। এমন জিনিস দেব যে মনে রাখবেন। আপনি আসুন, বাড়ীটা তো দেখাই···

চোপড়া : কি হবে, অকারণ সময় নষ্ট।

শরণ : ওহো, চোপড়া সাহেব, কি বলছেন আপনি। আপনি হলেন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীদের কি কাজ। ব্যবসা করা। ওরা জিনিসের দাম সস্তা দেখলেই চটপট কিনে নেবে, আর দর চড়লেই বিক্রী করে দেবে। আমাদের ঐ লালা লালচান্দজী···আরে ঐ তেলওয়ালা। ছমাস আগে আমার হাতে এক টুকরো জমি ছিল। যে বিক্রী করছিল তার খুব দরকার। আমি লালচান্দজীকে বল্লাম, সওদাও হয়ে গেল—হলোও খুব সস্তায়। আর সেই জমিটাই গত সপ্তাহে আবার বিক্রী করিয়ে দিলাম তিন হাজার লাভে। যে কাজে দু-চার পয়সা লাভের পথ রয়েছে, ব্যবসায়ীরা তা কখনো ছেড়ে দেয় ?

চোপড়া : না সর্দারজী, মানে আমি ব্যবসায়ী সে কথা অস্বীকার করছি না, কিন্তু সময়-অসময়টাও তো দেখতে হয়।

শরণ : আমার কথা শুনুন, এটা ভেবে দেখুন। ভাবতে ক্ষতি কি ?

চোপড়া : হ্যাঁ, তা ঠিক।

শরণ : এলাকাটা ভেবে দেখুন—চাঁদনী চক। দিল্লীতে এতো সস্তায় তো পাওয়াই মুশকিল।

চোপড়া : সস্তা ? কি বলছেন ? দাম যা শোনাচ্ছেন মাথা ঘুরে যায়। কিছু রিজনেব্‌ল দাম বলুন।

শরণ : দাম কি ? আপনি এখনও তো কিছু দেন নি। মালিকের মাল—সে ইচ্ছে করলে লাখ টাকা চাইতে পারে, আপনি আপনার সামর্থ্যে যা কুলোয় তার মধ্যেই দেখবেন খদ্দের হিসেবে। এতে আর চটাচটির কি আছে ? নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তো সবাই কাজ করে। আপনি একবার বাড়ীটাতো দেখুন। দেখলেই যে কিনতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।

চোপড়া : তা অবশ্য ঠিকই। কিন্তু আজকাল আমি ছেলেকে অন্য কোনো বিজনেস শুরু করাবার চেষ্টায় আছি। এ বছরই বি এ পাশ করলো ছেলেটা।

শরণ : নিশ্চয়ই করবেন। কাজ করাই তো উচিত। আলাদা করাবার কি দরকার। এখনও বেচারা কিছু বোঝে না--বাচ্চা রয়েছে। আপনি মানুন আর নাই মানুন, সময় এখন বেশ খারাপ যাচ্ছে। মনে হয় ওকে আরও পড়াতে দেওয়া উচিত, তারপর কোনো একটা চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলেই হবে।

চোপড়া : চাকরী পাওয়া কি অত সহজ নাকি আজকাল ?

শরণ : কি বলেন, আপনার ছেলের চাকরীর অসুবিধে ? কতো উঁচুউঁচু মহলে চেনাশোনা আপনার। যেখানেই চান সুপারিশ করে বসিয়ে দিলেই হলো।

চোপড়া : আপনারও তেমনি কথা। আর তাছাড়া বিজনেসের সঙ্গে কি আর চাকরীর তুলনা হয়।

শরণ : এটা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু…যদি কিছু মনে না করেন তো বলি—আজকাল ছেলে-পিলেরা মা-বাপকে আর দেখে না। আপনি আমার বন্ধু, তাই এসব বল্লাম আর কি ?

চোপড়া : না সর্দারজী, আমার ছেলে আমার সামনে চোখ তুলে কথা বলার সাহসই রাখে না।

শরণ : তাহলে ঠিক আছে। একটা কাজের কথা বলি। বন্ধু হিসেবে শুনবেন ? কাজটাও খুব ঠাটের—একেবারে রাজার হাল।

চোপড়া : বলুন, বলুন।

শরণ : শুনুন তাহলে। এই বাড়ীটা রণজিতের নামে কিনে দিন। লোকে বাড়ীর বিজনেসও তো করে ? … আরও ভাল ভাল সওদা এনে দেব আমি।

চোপড়া : (চিন্তিত) হুঁ, এটা অবশ্য ভালই বলেছেন। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ভালই হবে।

শরণ : বেশ চলুন, কথাবার্তা বলুন, আপনি এখানে দাঁড়ান… আচ্ছা ঐ সামনের হোটেলটায় অপেক্ষা করুন একটু। বাড়ীর মালিকের সঙ্গে কথা বলে এখুনি সামনা-সামনি কথা বলিয়ে দিচ্ছি।

চোপড়া : কিন্তু দাম তো ভীষণ বেশী বলছেন।

শরণ : বাড়ীটার ভেতর দেখলে বুঝবেন কি জিনিস। খুব মেজাজ

করে বানিয়েছিল বাড়ীটা। আপনি তো জানেন, মুখে যতই চান, মৃত্যুও সহজে আসে না। আপনি চিন্তা করবেন না, দামের ব্যাপারে আমি নিজেই কথা বলিয়ে দেব। বাড়ীর মালিক বেশ শক্ত মহিলা। বেশ বোঝাতে-সোজাতে হবে। ওর তো এ বাড়ীটা জীবনের চেয়েও প্রিয়।

চোপড়া : সে আপনিই জানেন। যা করবার করবেন।

শরণ : নিশ্চয়ই, সেটা তো আমারই কাজ। দালালীর পয়সা নয় তো কিসের জন্য নেব। (এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কিশন দেবীর বাড়ীর বৈঠকখানা)

[ঘর সাজানোর ধরন থেকে নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনধারা ফুটে ওঠে। সাধারণ আসবাব, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সামনে দেওয়ালে র‍্যাকে কিছু বই ইত্যাদি। একদিকে খাট পাতা, তার সামনে দুটো চেয়ার। পর্দা উঠতেই দেখা যাচ্ছে কিশন দেবী ঘরের জিনিস-পত্র ঝাড়-পোঁচ করছেন। সাধারণ কাপড় পরণে মধ্যবয়স্ক মহিলা।]

কিশন দেবী : (র‍্যাকে সাজানো বই ঝাড়তে ঝাড়তে) ইস্, কি ধুলো জমেছে বইগুলোয়···সুদর্শন···আরে ও সুদর্শন।

(সতের আঠারো বছরের এক যুবকের প্রবেশ)

সুদর্শন : কি বলছো?

কিশন : তুই নিজের ঘরটা পরিষ্কার করিস না? দেখ তো বইয়ে কি ধুলো পড়েছে।

সুদর্শন : মা, আমি তো এক্ষুণি বাজার থেকে ফিরলাম।

কিশন : ও হ্যাঁ, আমার মনেই ছিল না। ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করলে আমার কিছু মনে থাকে না, পাগল হয়ে যাই একেবারে। একটু খেয়াল না করলে ঘরের চেহারাই পাল্টে যায় একেবারে।

সুদর্শন : কিন্তু, তুমি তো সারাদিন এই-ই করছো।

কিশন : হ্যাঁ, এই করছি। একবার গিয়ে দেখ্, বাইরে মেঝেটা কি চক্‌চকে হয়েছে। দেখে মন ভরে যায়। তাছাড়া আমি তো

কাউকে বিরক্ত করি না, নিজের কাজ নিজেই করে নিই।

(দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

কিশন : দেখ্ তো সুদর্শন কে এলো ?

(সুদর্শন বাইরে যায়। কিশন দেবী বইগুলো গুছিয়ে
বিছানার চাদরটা ঝেড়ে পেতে রাখে।
সুদর্শনের পুনঃপ্রবেশ)

সুদর্শন : শরণ সিং দালাল এসেছে।

কিশন : (মাথায় ঘোমটা টেনে) আবার এসেছে লোকটা। এই দালালগুলো জ্বালিয়ে খেল একেবারে। কেউ না কেউ মাথা খারাপ করতে আসবেই।

(শরণ সিংএর প্রবেশ)

শরণ : নমস্কার, বৌদি।

কিশন : (রাগত স্বরে) কি ভাই আবার এসেছ। কতবার বলেছি যে বাড়ীটা বিক্রী করবো না। করবো না, করবো না। কি ঠেকা পড়েছে আমার? আর এটা জবরদস্তি নাকি ?

শরণ : না বৌদি, আপনি চটে যাচ্ছেন অকারণ। আমি তো কিছু বলিনি।

কিশন : তুমি আমার সঙ্গে একবার কথা বলে গেলে, সব ঠিক করে গেলে, তারপর ছমাস তোমার পাত্তা নেই। তোমাকে কতবার বলেছি যে এখন আমার বাড়ী বিক্রীর কোনো দরকার নেই। কিন্তু কে জানে তোমরা কি ধাতুর তৈরী, অকারণে মাথা খারাপ করতে আসো।

শরণ : আপনি বসুন একটু, আমার কথাটা তো শুনবেন।

কিশন : কি শুনবো কি ? শোনার মতো কিছু থাকলে তো শুনবো। এতো ঘোরাঘুরি করে পা ব্যথা হয় না তোমার ? পাঁচ-সাত দিন পর আবার এসে হাজির হও।

শরণ : আপনি আমার কথাটাই তো শুনছেন না। আমি আপনাকে বাড়ী বিক্রী করার কথা কি বলেছি। আপনি বিক্রী করুন, না করুন আপনার ইচ্ছে—জিনিসটাই তো আপনার। কিন্তু আমি যদি আপনার কাজে আসি, কিছু সেবা করতে পারি তো বলুন।

কিশন : (শান্ত হয়ে) তাহলে···কি বলার আছে তোমার ?

শরণ : বৌদি, কথাটা তো তা নয়···(কথা ঘুরিয়ে) আপনি হয় তো জানেন যে আমি করোলবাগে থাকি। আপনাদের আশীর্বাদে ওখানে আমার নিজের বাড়ী আছে। দুটো কামরার মেঝে খারাপ হয়ে গেছে, আবার করতে হবে। আমি নিজের বৌদিকে বলেছি যে আপনার বাড়ীর মেঝেটা দেখবার মতো। ও আমার মাথা খেয়ে ফেললো, রোজ বলে যে আমাকে ওঁর বাড়ীর মেঝেটা দেখাও— অমনি মেঝে আমরাও করাবো।

কিশন : (খুশী হয়ে) সঙ্গে নিয়ে এলেই তো পারতে ?

শরণ : না, আমি ভাবলাম আগে আপনার সঙ্গে কথা বলে নেই, নয় তো বলা নেই কওয়া নেই হুট করে এসে পৌঁছানো—

কিশন : না না তাতে কি ? এতো তোমাদেরই বাড়ী। নিশ্চয়ই আসবে, যখন খুশী এসো।

শরণ : আমি তো রোজ বাড়ী বিক্রী করাচ্ছি, কিন্তু আপনার বাড়ীর মতো এমন সুন্দর পরিষ্কার আর সুন্দর ডিজাইনের মেঝে কোথাও দেখিনি।

কিশন : আরে ভাই, অনেক ভেবে চিন্তে বাড়ীটা করিয়েছি মনের মতো করে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মনের মতো মেঝে করিয়েছি। সুদর্শনের বাবারও সুন্দর করাব বড়ো সখ ছিলো।

শরণ : হ্যাঁ, তাতো জানি। ওঁর সঙ্গে আমার খুব ভাল পরিচয় ছিলো। কতো মেজাজ করে সুন্দর বাড়ী করলেন, কিন্তু ভোগ করার সুযোগ পেলেন না—যাক্ তবু ওঁর ছেলেপিলেরা খুশী থাকলেই ভালো। এখন তো ছেলেও বড় হয়ে গেছে। কি নাম বাবা তোমার ?

সুদর্শন : আজ্ঞে, সুদর্শন।

শরণ : কোন ক্লাশে পড়ছ ?

কিশন : সুদর্শন এবার ফার্স্ট ডিভিশানে ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

শরণ : তাহলে বৌদি অভিনন্দন আপনারই প্রাপ্য। সত্যি বড়ো খুশী হলাম। হাজার হোক আমার বন্ধুর ছেলে! আমার মনটাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন আমার যত ভালো লেগেছে, বোধহয় আপনারও

তত লাগেনি।

কিশন : তোমরা সবাই খুশী হলেই ভালো। প্রথমে তোমাকে আজেবাজে বলেছি বলে কিছু মনে কোরো না।

শরণ : আপনার কি দোষ। হাজার হলেও আমি তো প্রপার্টি ডিলার।

কিশন : আরো দুজন দালাল আছে, মাঝেমাঝেই এখানে আসে। বারবার ঐ এক কথা শুনলে মনটা বড়ো খিঁচড়ে যায়।

শরণ : এতো ওদের বোকামী। একবার যা বলা হয়ে গেছে, আবার করে তার মধ্যে যাওয়ার কি মানে। রোজরোজ কি একই তরকারী খাওয়া যায় ? অদল-বদল করে তৈরী করতে হয় তরকারী।

কিশন : (স্মিতহাস্য) ঠিক বলেছো।

শরণ : সব সময় নতুন চিন্তা, নতুন কথা, নতুন ডিজাইন, নতুন ফ্যাশান, নতুন স্টাইলের দাম বাড়ে। সারা পৃথিবীই নতুনের পেছনে দৌড়চ্ছে। তাই আপনারাও আমাদের মতো পুরোনো ধরনের দালালদের ক্যানভাসিং শুনে চটে যান।

কিশন : ওহ্-হো, ভুলেই গেছিলাম। চা, শরবৎ কিছু খাবে তো। বাইরে রোদ্দুর থেকে এলে।

শরণ : না না, আমার তেষ্টা পায়নি।

কিশন : যাতো বাবা, মামার জন্যে একটু শরবৎ করে নিয়ে আয়।

সুদর্শন : যাচ্ছি মা। (প্রস্থান)

(এক মিনিট নিস্তব্ধতা)

শরণ : ওর বাবা যখন মারা যান সুদর্শন তো খুবই ছোট ছিল।

কিশন : আট বছরের ছিল তখন।

শরণ : এখন কি চটপটে হয়েছে। ম্যাট্রিকও পাশ করে গেছে। ওর বাবা থাকলে দেখে কত খুশী হতেন।

কিশন : (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) তাতো ঠিকই ভাই। কিন্তু কপালের লিখন কে খণ্ডাবে বলো। প্রবাদই আছে তো রাই কমে, তিল বাড়ে —যা লেখে লিখনে।

শরণ : সত্যি খারাপ লাগে।

কিশন : সময়কে কি করে ঠেকান যায়। ওর মন্দ ভাগ্য মেনে নিতেই হবে—এমন সাজানো বাগান ছেড়ে চলে যেতে হলো ওকে।

শরণ : আমার সঙ্গে বড়ো ভালো সম্পর্ক ছিলো। আমার সহপাঠী ছিলেন। একসঙ্গে পড়েছি, খেলেছি। খুব মিশুকে স্বভাব ছিল।

কিশন : ওর প্রশংসা তো সকলেই করে।

শরণ : সেই যে বলে না, ভালো লোকদের ভগবানেরও দরকার পড়ে, সেই জন্যেই ওদের তাড়াতাড়ি ওখানে ডেকে নেন।

(সুদর্শন গেলাস নিয়ে আসে)

সুদর্শন : এই নিন, শরবৎ।

কিশন : নাও, খেয়ে নাও।

শরণ : (গেলাস ধরে) অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে।

কিশন : জল খাবে, তাতে আর কষ্ট দেওয়া কি ?

(শরবৎ খেয়ে শরণ সিং গেলাস ফেরৎ দেয়)

শরণ : নাও বাবা, গেলাসটা ধরো।

সুদর্শন : আর একটু খাবেন ?

শরণ : না বাবা, ব্যস···(গলা ঝেড়ে) তা এখন সুদর্শনকে কোন কলেজে ভর্তি করাচ্ছেন ?

কিশন : তাই তো ভাবছি কি করা যায় এবার ? আরও পড়াশোনার খরচও আছে। রোজগার বলতে তো ঐ বাড়ীটার ভাড়া।

শরণ : কিন্তু বারো চোদ্দ ক্লাশ পাশ করলেই বা আজকাল চাকরী কোথায় ?

সুদর্শন : চাকরীর চেষ্টা করছি। আজও ইন্টারভ্যু দিতে গিয়েছিলাম।

শরণ : বাবা, ইন্টারভ্যুও তো আজকাল প্রায় লোক-দেখানোই হয়। শুধু চাল—কাগজে কলমে দেখানোর জন্যে। প্রায়ই বড়ো বড়ো সুপারিশের জোরে আগেই লোক রেখে নেয়।

কিশন : এটা তো লোকঠকানো ব্যাপার।

শরণ : তা নয় তো কি ? নয় তো ছেলেকে বড়ো বড়ো কোর্স পড়ান যাতে সে সোজা একেবারে খুব বড়ো অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র, জজ-ব্যারিস্টার হতে পারে। নয় তো শুধুই ধাক্কা খেতে হবে। আর

আজকাল বেকারীও এতো বেড়ে গেছে যে বি এ পাশ ছেলে সব ছোট-ছোট চাকরীর জন্যে মাথা খুঁড়ে মরে যাচ্ছে।

কিশন : হুঁ। সুদর্শন বল্ কি পড়বি?

শরণ : বৌদি, বড়ো মাথার ব্যথাও বড়ো হয়। ওসব পড়া কি অতো সোজা ব্যাপার। খরচের কথা শুনলে মাথা ঘুরে যায়। আমার কথা যদি শোনেন তো বলি ছেলেকে ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিন।

সুদর্শন : হ্যাঁ মা, সেই ভালো।

কিশন : এসব কি বুঝবি তুই? এখনো তুই ছেলেমানুষ।

শরণ : ও ঠিক পড়ে পড়েই হাঁটতে শিখবে। পৃথিবীতে কে আর সবকিছু প্রথমেই শিখে বসে থাকে। আপনার এতো বড়ো বাড়ী এটার পয়সাতেই ছেলেকে লাগিয়ে দিন। প্রবাদ আছে না—সোনাই গলে, সোনাই ফলে।

কিশন : (একটু জোরে) কিন্তু আমি তো বাড়ী বিক্রী করতে রাজী নই। নিজের বাড়ীতে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু তো আছে। আমি তো ভাই প্রথমেই তোমায় বলেছি যে বাড়ী আমি বিক্রী করবো না।

শরণ : আপনিও ভুল বুঝেছেন বৌদি। আমি কখন বল্লাম বাড়ী বেচার কথা। এতো কথায় কথায় এসে গেল কথাটা। আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করতে চাই না। তাড়াহুড়োও কিছু নেই, একটু ভেবে চিন্তে দেখুন। ভেবে দেখতে তো আর দোষ নেই।

সুদর্শন : হ্যাঁ, কি ক্ষতি এতে?

শরণ : দেখুন, ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন কেন? ভেবে বিবেচনা করে দেখার জন্যে। হাজার হলেও আপনার ছেলের ভবিষ্যতটা তো আপনাকেই তৈরী করতে হবে। আপনিই ওকে পথ দেখাবেন, দেখা-শোনা করবেন আপনিই। আমার তো মনে হয় আপনার ছেলে যেন শ্রবণকুমার, কোনো চিন্তা নেই ওর জন্যে। ছেলে কাজ শুরু করে দিলে আর ভাববার কোনো কারণই নেই। প্রবাদ আছে না, যেমন যেমন কম্বল ভেজে, তেমন তেমন ভারী হয়।

কিশন : কি বলিস সুদর্শন, কোনো ব্যবসায় লেগে যাওয়াই তো ভালো, তাই না?

সুদর্শন : তুমি যা ভালো বোঝ, বলো।

শরণ : ব্যবসার জন্য তো টাকা-কড়ির দরকার। যদি বাড়ী বেচার কথা ভাবেন, তাহলে এর থেকে আঠারো হাজার পাওয়া যেতে পারে।

কিশন : (রাগত স্বরে) আঠারো হাজার ? ভাই, তুমি তো অবাক করে দিলে। এই তো তিন মাস আগেই এক দালাল বাইশ হাজারে করিয়ে দিচ্ছিল, তাও খুব চাপাচাপি করে।

শরণ : হতে পারে। কিন্তু সময় অনুযায়ীই তো সব হয়।

কিশন : আমি তো বাইশ হাজারের এক পয়সা কমে দিতে রাজী নই।

শরণ : আমিও বলছি কম নেওয়া উচিত নয়। আমার তো চেষ্টা যত দাম চড়ে তার—তাতে দালালীর কমিশনও বাড়বে। কিন্তু এও আমি বলছি যে এক দর ধরে বসে থাকাটাও ঠিক নয়। প্রয়োজন মতো খদ্দেরও তো সব সময়ে পাওয়া যায় না। যাক্‌গে, আপনি ভেবে দেখুন। আমি আসি...

কিশন : না, আমি তো বাইশ হাজারের এক পয়সা কম নেব না।

শরণ : (ফিরে এসে) ও হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ে গেল। আচ্ছা আপনার বাড়ীর সামনে একটা কূয়ো ছিলো না ?

সুদর্শন : হ্যাঁ, ছিলো।

শরণ : সেইজন্যেই তো লোকে বলে কূয়োর সামনে বাড়ীতে ভাগ্য বনে না।

কিশন : কিন্তু সে কূয়ো তো কবে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শরণ : তাতে কি ? তার ফলটা রয়েই যায়। কূয়োয় ভূত-প্রেত সব থাকে। বোধহয় এর জন্যেই এ বাড়ীতে আপনাদের সুখভোগ হলো না।

সুদর্শন : (আশ্চর্য হয়ে) ভূত-প্রেতও আবার হয় নাকি ?

কিশন : সত্যিই এখানে সুখ পেলাম না আমি। যখন সুদর্শনের বাবা মারা যান তখনও বাড়ী তৈরীর একবছর পুরো হয় নি।

শরণ : অবশ্য এখন আমার হাতে একজন খদ্দেরও আছে। কাছেই

রয়েছে। আমি ওকে নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি। (প্রস্থানোদ্যত)

কিশন : কিন্তু ভাই, আমি তোমায় বলে দিয়েছি কম করবো না।

শরণ : (যেতে যেতে) আপনি চিন্তা করবেন না। সুদর্শনের বাবা আমার বন্ধু ছিলেন। এতো আমার নিজের কাজ। (প্রস্থান)

কিশন : কি বলিস সুদর্শন, বাড়ীটা বিক্রীই করে দিই, কি বল ?

সুদর্শন : তোমার যেমন ইচ্ছে করো। কিন্তু ও যেন বলছিল সামনে ভূতটুত থাকে, আমার কিন্তু ভয় করছে মা।

কিশন : যাঃ, পাগলামী করিস না। এতোবড়ো হয়ে গেছো আবার ভূতের ভয়। হ্যাঁরে তোর ইন্টারভ্যুয়ে কিছু হল ?

সুদর্শন : এখন কি করে বলবো ? তবে চাকরী পাওয়া অসম্ভব। ওরা মাত্র আট জনকে রাখবে, এসেছিল পঞ্চাশ জন। তার মধ্যে আবার বি এ পাশও আছে।

কিশন : শরণ সিং ঠিকই বলেছে। বাড়ী বিক্রী করে নিজের ব্যবসা শুরু করে দে। কিন্তু কি ব্যবসাই বা করবি ?

সুদর্শন : যা তুমি বলবে।

কিশন : তুই রোজগার করতে শুরু করলে কত বাড়ী বানিয়ে নিতে পারবি। তোর বিয়ে দেব, ছোট্ট টুকটুকে একটা বউ আসবে। আমিও মরার আগে নাতিপুতি দেখে যাবো, শখ পুরো করে যাবো।

সুদর্শন : (সলজ্জ) ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে।

কিশন : আচ্ছা, ভগবান কি আমার কথা শুনবেন। এতো সুন্দর বউ আনবো যে ঘরে বসে থাকলে বাইরেটাও আলো হয়ে যাবে। তারপর ছোট্ট নাতি হবে—রাতদিন ওর সঙ্গে খেলব। আমার জন্যেও ভগবান সুখের গাছ পুঁতবেন একটা।

(দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

সুদর্শন : মনে হয় শরণ সিং এসে গেছে।

শরণ : (ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে) হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। আমিই এসেছি। (চেঁচিয়ে ডাকে) আসুন, চোপড়া সায়েব, ভেতরে আসুন।

(চোপড়ার প্রবেশ)

চোপড়া : নমস্কার।

কিশন : নমস্কার, আসুন, বসুন।

শরণ : দেখুন চোপড়া সায়েব, এই হলো আমার বৌদির বাড়ী। এটা ড্রইং রুম, ঐ দেখুন পেছনে আর একটা ঘর, তার পেছনে আর একটা ছোট ঘর। বাড়ীটা ষোলো গজ লম্বা আর ছ'গজ চওড়া।

চোপড়া : 16 গজ × 6 গজ।

শরণ : আড়াই তলা। এত সুন্দর, দেখে মন ভরে যায়।

কিশন : আমি তো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মনের মতো করে বাড়ীটা তৈরী করিয়েছিলাম। ভিতটা খুব মজবুত করে বানানো। আর মেঝেটা এত চক্‌চকে যে মুখ দেখা যায় একেবারে। ওপরের ঘরগুলো তো খুবই সুন্দর।

(চোপড়া উঠে এদিক ওদিক, দেওয়াল, ছাত, বাইরের দিক দেখতে থাকে।)

শরণ : বাবা, তুমি গিয়ে ওঁকে ওপরের ঘরগুলোও দেখিয়ে দাও।

চোপড়া : হ্যাঁ চলো, সিঁড়ি কোন দিকে।

সুদর্শন : আসুন, আমার সঙ্গে।

শরণ : এদিকে, সিঁড়ি এদিকে চোপড়া সায়েব।

(সুদর্শন আর চোপড়া ভেতরে চলে যায়)

কিশন : তুমি দামটা বলেছ তো ওঁকে।

শরণ : আমি তো বাইশ হাজার বলেছিলাম। ও একেবারে কানে হাত চাপা দিয়েছে। শেষে বললাম, চলো, বৌদিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি কিছু কম করা যায়।

কিশন : না, আমি তো এক পয়সাও কম নেব না।

শরণ : ওকে সঙ্গে আনতেই হবে। কাজও করতে হবে। আপনাকে জিজ্ঞেস না করেই ওকে একুশ-বিশ হাজার বলেছিলাম। ভেবেছিলাম আপনি আমার কথা ঠেলবেন না। আর তাছাড়া এখনও তো সব ফয়সলা হয়নি।

কিশন : দেখুন, কোনো জবরদস্তি নয়, আমি কম নেব না।

শরণ : এতোটা কড়াকড়ি করবেন না বৌদি। আপনি নিজেই দেখুন বাজার দিন দিন কেমন মন্দা যাচ্ছে। কোন জিনিসটা আছে

যার দাম পড়ছে না। সোনা, রূপো, গুড়, চিনি, ঘি, গম—সব কিছুতে মন্দা। তিন মাস আগে একটা বাড়ীর জন্যে বত্রিশ হাজার দেওয়াচ্ছিলাম, তখন শুনলো না, এখন বলে আঠাশ হাজারই করিয়ে দাও। কিন্তু কোনো খদ্দেরই পঁচিশের বেশী উঠতে চায় না। বলুন এখন, আমি কি করি।

কিশন : তাহলে আর তোমায় দিয়ে করানোর মানে কি, পুরো দামই যদি দেওয়াতে না পারো—

শরণ : কিন্তু, এটাও ভেবে দেখুন, ভেবে চিন্তে তো বলতে হবে যাতে খদ্দের না পালায়। আর এও না হয় যে দুচার মাস পরে দর আরও পড়ে গেল।

কিশন : (ব্যঙ্গ করে) হ্যাঁ, দাম তো পড়বেই।

শরণ : যদি বলেন তো, বিশ হাজার বলে দেখি ?

কিশন : না না, বিশ তো খুবই কম হচ্ছে।

শরণ : ঠিক আছে, চেষ্টা করবো যাতে বাড়ে বিশ-একুশে হয়ে যায়। ও এলে আপনি একটু ভেতরে চলে যাবেন যাতে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি আলাদা করে।

কিশন : একুশ হাজারের কমে একেবারে নামবে না।

শরণ : আসুন চোপড়া সায়েব, দেখে এলেন ?

কিশন : আচ্ছা, আপনারা কথা বলুন, আমি আসছি। সুদর্শন আমার সঙ্গে একটু আয়। (দুজনেই ভেতরে যায়।)

শরণ : কি চোপড়া সায়েব, ফাস্টক্লাশ বাড়ী কিনা বলুন ? দারুন, দারুন জিনিস।

চোপড়া : হ্যাঁ, বাড়ীটা তো ভালোই। তো বাড়ীর মালিক কে ?

শরণ : ঐ বিধবা মহিলারই বাড়ী।

চোপড়া : এঁর স্বামীর নাম কি ?

শরণ : ওঁর নাম !...আজ্ঞে, নাম তো জানি না। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল না। সে জেনে নেব অবশ্য। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। কোনো গণ্ডগোল নেই। বাড়ী নিজেদের বানানো। ঐ একই ছেলে, মা ওর গার্জেন।

চোপড়া : তা দর কত পড়বে ? আঠারো হাজারে হবে নাকি ?

শরণ : আপনি তো ঠাট্টা করছেন বাড়ী দেখে তবে বলুন দর কত হওয়া উচিত। কোথায় বাইশ হাজার, আর কোথায় আঠারো। উনি তো মানছেনই না। তবে মনে হয় একুশ হাজারে রাজী হয়ে যাবে। তাও খুব চাপাচাপি করতে হবে।

চোপড়া : একুশ হাজার বেশী হচ্ছে। বড্ড বেশী। আমার মনে হয় এ বাড়ীর সামনে একটা কূয়ো ছিলো। কূয়োর সামনের বাড়ী এমনিতে লোকে সন্দেহ করে।

শরণ : সেতো কবে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর চোপড়া সায়েব আপনিও আশ্চর্য। পড়াশোনা করে এখনও সেই পুরোনো কথায় বিশ্বাস করেন। মিছিমিছি ভুল করছেন আপনি।

চোপড়া : তবুও ভয় লাগে।

শরণ : কখনো ভাবার চেষ্টা করেছেন কি যে এরকম বিশ্বাস কেন হয়েছে ?

চোপড়া : কেন হয়েছে ?

শরণ : একবার এক বুড়ো কূয়োর সামনে একটা বাড়ী নিয়েছিল। কূয়োর জলের জন্যে, চানের জন্যে নানান ধরনের লোক আসতো। ওখানে সব কমবয়সী ছেলেরা তেল মেখে স্নানের আগে ব্যায়াম-টায়ামও করতো। বৃদ্ধের যুবতী বউ জানালা দিয়ে ওদের দেখতো। ওদের মধ্যে একটা ছেলের সঙ্গে বউয়ের লট্‌ঘট্ হয়ে যায়। ব্যাস হয়ে গেল—লোকে ধরে নিল কূয়োর সামনে বাড়ী ছিল বলেই বুড়োর এমন দুর্ভাগ্য, যেন কোন ভূত ওকে উঠিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।

চোপড়া : (সহাস্যে) বা বেশ বলেছেন সর্দারজী। আপনার তো অনেক গল্প জানা আছে।

শরণ : লালাজী, কথা বেচেই তো খাই আমরা।

চোপড়া : তাহলে, কি ঠিক করলেন ?

শরণ : আপনি যা বলবেন। কিন্তু দরটা একটু চড়াতেই হবে আপনাকে।

চোপড়া : ঠিক আছে উনিশ হাজারেই রফা হোক।

শরণ : আমার কি, আমি কথা বলে দেখছি। আপনি বাইরে একটু অপেক্ষা করুন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে নিই।

চোপড়া : ঠিক আছে। (বাইরে চলে যায়।)

শরণ : (ডাকে) বৌদি,...সুদর্শন।

(দুজনেই আসে)

কিশন : কি কথা হলো?

শরণ : হবে বলে মনে হচ্ছে না। দিনকাল পাল্টেছে। খদ্দেররা এখন পয়সা খরচ করতে ভয় পায়। খুব চেষ্টা করলে উনিশ হাজারে দাঁড়াতে পারে।

কিশন : ছাড়ুন তাহলে, বাড়ী আমি বেচবো না। আমি তো তোমার কথা রাখতে এক হাজার কমিয়েছিলাম।

সুদর্শন : হ্যাঁ, যেতে দিন। না হয় তো না হবে। বাড়ী তো পড়ে নেই।

শরণ : ভেবে দেখুন। হাতের খদ্দের ফিরানো ঠিক হবে না। তাছাড়া বাড়ীটাও ব্যাঘ্রমুখী বাড়ী।

সুদর্শন : ব্যাঘ্রমুখী? সেটা আবার কি?

শরণ : যে বাড়ী সামনের দিকে বেশী চওড়া, পেছন দিকে কম তাকে বলে ব্যাঘ্রমুখী বাড়ী।

সুদর্শন : তাতে কি? এটা তো দোষের নয়।

শরণ : ব্যাঘ্রমুখী বাড়ী মালিকের জন্য ভালো নয়। বাঘ যেমন অন্য জন্তুদের খেয়ে নেয়, তেমনি এসব বাড়ীও মালিকদের বহু উপদ্রব সৃষ্টি করে।

সুদর্শন : (চিন্তিত) মা, বাবা কি এখানেই মারা যান?

কিশন : পাগলামী করিস না।...দেখুন আপনিও এসব উল্টো-পাল্টা বলবেন না। তাছাড়া আমাদের বাড়ীর আসল রাস্তা তো পিছনে—ওটা আমরা বন্ধ করে রেখেছি। ঐ রাস্তাটা খুলে দিলে বাড়ীটা কি গোমুখী হয়ে যাবে?

শরণ : ও রাস্তাটা খুললে বাড়ী তো দুমুখো হয়ে যাবে।

কিশন : দুমুখো বাড়ীতে কি ক্ষতি?

শরণ : ক্ষতি নয় ? দুমুখো সাপ—সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

সুদর্শন : তাহলে মা, কি করবে এখন ?

শরণ : আপনার জিনিস আপনি বেচুন আর নাই বেচুন, আমার কি বলার আছে। আমি নিজের দালালীর জন্য কাউকে ভুল তো বোঝাতে পারি না। সেইজন্যে আমার সব বন্ধুরা প্রপার্টির সব কাজ আমাকে জিজ্ঞেস করে তবে করে।

কিশন : তোমার কি মত ?

শরণ : আমার মতে তো খদ্দের ছাড়া উচিত হবে না। এক তো বাড়ীটায় নানান ভয়ভীতি রয়েছে, তাছাড়া আপনারও পয়সা-কড়ি দরকার। ছেলের ব্যবসা-পত্তর শুরু করতে হবে। তৃতীয়ত, মার্কেট তো দিনের পর দিন মন্দা হচ্ছে। আজ যা দর, কাল আর থাকছে না।

কিশন : কিন্তু আমি তো কুড়ি হাজারের নীচে কিছুতেই দিতে পারি না। সে উনি বাড়ী কিনুন আর নাই কিনুন।

শরণ : ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখছি, আপনারা ভেতরে যান। চোপড়া সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

কিশন : আয় সুদর্শন, ভেতরে আয়। (দুজনেই ভেতরে যায়)

শরণ : (দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকে) চোপড়া সাহেব, ও চোপড়া সাহেব। আসুন। (চোপড়ার প্রবেশ)

চোপড়া : বলুন, কি বক্তব্য ?

শরণ : চোপড়া সাহেব, আপনিও মনে রাখবেন যে কি শরণ সিং-এর পাল্লায় পড়েছিলাম। নিন, কুড়ি হাজারে কথা বলিয়ে দিচ্ছি।

চোপড়া : ন্ না। আমি তো কোনো মতেই উনিশের উপরে পারবো না। ইচ্ছে হয় বিক্রী করো, নয় তো দরকার নেই।

শরণ : দেখুন, উল্টোপাল্টা করবেন না। আপনি এলাকাটা তো দেখবেন—চাঁদনীচক। দিল্লীতে লোকে ছোটো ছোটো জায়গা কেনার জন্যে ছটফট করছে। কোথায় কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে সব—কেউ লোদী কলোনী, কেউ প্যাটেল নগর, কেউ জহর নগর, কেউবা একেবারে কিংস ওয়ে, জঙ্গপুরাতে গিয়ে লোকে থাকছে। এমন কি বেঁচে থাকতে থাকতেই লোকে ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক, দেবনগর, স্বর্ণপুরী এখানেই

বানিয়ে ফেলেছে।

চোপড়া : তার মানে জ্যান্ত লোকেরাও স্বর্গবাসী বলার অধিকার পেয়েছে। (দুজনেই হাসে)

শরণ : যা বলেছেন। আপনি তো সব বোঝেন। চোপড়া সায়েব দিল্লী চতুর্দিকে বেড়ে যাচ্ছে, এই এলাকাটা হচ্ছে একেবারে মাঝখানে।

চোপড়া : হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছেন।

শরণ : ঠিক বলে ঠিক। নিতান্ত আপনার সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক বলে একেবারে ষোলো আনা ঠিক বলছি। শুধু আপনারই লাভের জন্যে এটা করাচ্ছি। এখানে দিন-দিন দর চড়ছে। আমার কথা শুনুন—সুযোগ ছাড়বেন না।

চোপড়া : (এদিক ওদিক দেখে হঠাৎ বাড়ীর ডিজাইনটা দেখে) দেখুন সর্দারজী, এই ঘরটা—সামনের দিকটা বড়ো, পেছনটা ছোট। কেন ? আমার তো মনে হয় এটা ব্যাঘ্রমুখী। বাড়ীর মালিক এখানেই মারা যান না ?

শরণ : বাহ্ চোপড়া সাহেব, বাহ্। আপনিও ছেলেমানুষের মতো কথা বলছেন। বলুন তো এমন কোনো বাড়ী আছে যেখানে কেউ কোনোদিন মরেনি। জন্ম মৃত্যু তো একই সঙ্গে চলে। গল্প শুনেছেন হয়তো, বুদ্ধদেব এক স্ত্রীলোককে বলেন, যে ঘরে কেউ মরেনি তেমন ঘর থেকে মুঠিভরে শস্য এনে দাও, আমি তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। বেচারী দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু মুঠিভরে শস্য কোথাও পেল না। পাবেই বা কোথা থেকে ? শেষ অবধি ও বুঝতে পারলো সব বাড়ীতেই মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। বেচারী কাঁদতে কাঁদতে ছেলের মৃত্যুশোক সহ্য করলো।

চোপড়া : কিন্তু এতো সকলেই জানে যে ব্যাঘ্রমুখী বাড়ী ভীষণ অপয়া হয়।

শরণ : কিন্তু একে ব্যাঘ্রমুখী বলছেন কি করে, এটাতো গোমুখী বাড়ী। এর আসল রাস্তা পেছন দিকে। যদি আপনার মন খুঁতখুঁত করে তাহলে এদিকটা বন্ধ করে ওদিকটা খুলে নেবেন।

চোপড়া : তার মানে এর দুদিকে রাস্তা নাকি ?

শরণ : লোকে এমনি বাড়ী পছন্দ করে যার দুদিক দিয়ে রোদ-হাওয়া আসে। নতুন স্টাইলের বাড়ীগুলো দেখুন—কমসেকম দুদিক নিশ্চয়ই খোলা পাবেন।

চোপড়া : কিন্তু বাড়ীর আসল দরজাটা তো সেটাই, যেটা অনেক দিন ধরে চালু।

শরণ : চোপড়া সাহেব, অকারণ চিন্তা করে কি লাভ ? গোমুখী-ব্যাঘ্রমুখী তো শুনলেনই, আর তার মানে কি তাও আপনি জানেন।

চোপড়া : মানে আবার কি ?

শরণ : গোমুখী বাড়ীর ছাত নীচু হয়। বাড়ীর একটা পর্দা থাকে আসতে যেতে লোকে ভেতরে যাতে তাকাতে না পারে। দোকান ব্যাঘ্রমুখী ভাল, কেননা মাথা চওড়া হলে সাজাতে সুবিধে। আর এতে কি এসে গেল। ব্যাঘ্রমুখী আমাকে গিলে খাবে না, আর গোমুখীতে যে দুধের নদী বইবে তারও সুযোগ নেই।

চোপড়া : (সহাস্যে) তার মানে আপনি বলছেন যে ব্যাঘ্রমুখীর দিকটা দোকান করে নেব আর গোমুখীর দিকটা থাকার ব্যবস্থা।

(দুজনেই হাসে।)

শরণ : আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না, আপনি এত ভাবছেন কেন ? আম খাবেন, না গাছ গুনবেন ? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—দু-চার হাজার লাভই হবে আপনার।

চোপড়া : ঠিক আছে সর্দার সায়েব, আপনার কথাই থাক।

শরণ : তাহলে কুড়ি হাজারেই পাকা করে দিই।

চোপড়া : না, উনিশের বেশী নয়।

শরণ : বাহ্ এটা কি বলছেন। এতোটা কড়াকড়ি করলে চলে না, একটু ঢিল ছাড়তেই হবে। সাড়ে উনিশ বলি ? তারপর ওঁর মর্জি।

চোপড়া : সাড়ে উনিশের থেকে এক পয়সা বেশী দেব না।

শরণ : আপনি চিন্তা করবেন না। টাকা কড়ির ব্যবস্থা করুন। (চেঁচিয়ে ডাকে) সুদর্শন, সুদর্শন, বৌদিকে একটু পাঠিয়ে দাও।

(দুজনেরই প্রবেশ।)

কিশন : বলো, কি হলো ?

শরণ : বসুন বৌদি, এ্যাডভান্সটা আগে দিইয়ে দিই। চোপড়া সায়েব একশো টাকার নোট বের করুন।

চোপড়া : (মানিব্যাগ থেকে টাকা দেয়) নিন সর্দারজী।

শরণ : (টাকা দিতে দিতে) এই নিন বৌদি একশো টাকা। সাড়ে উনিশ হাজার।

কিশন : (নোট সরিয়ে) না না ভাই। তোমাকে তো প্রথমেই বলেছি কুড়ি হাজারের এক পয়সা কম নেব না।

শরণ : বৌদি, টাকাটা তো ধরুন।

কিশন : টাকা কি করে নেব ? আমি তো এমনিতে দুহাজার কমে রাজী হয়েছি। ছেলে আমার চটে গেছে।

সুদর্শন : না সর্দারজী, কুড়ি হাজারের কমে হবে না।

শরণ : চোপড়া সাহেব, ছাড়ুন তাহলে। পরে দেখা যাবে কোথাও। পাঁচশোর জন্যে অবশ্য এমন সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না।

চোপড়া : কি বলছেন সর্দারজী, আমি তো কথার থেকে পাঁচ শো বেশী দিচ্ছি।

শরণ : ঠিক আছে, আমার জন্যে না হয় আরো পাঁচ শো করে দিন। অন্যবারে পুষিয়ে দেব।

চোপড়া : না সর্দারজী। তা হয় না। আমি কিছুতেই সাড়ে উনিশের বেশী দিতে পারব না।

শরণ : আচ্ছা ঠিক আছে, আমার ওপর ফয়সলা করার ভার ছেড়ে দিন। নিন বৌদি, ধরুন টাকা···আরে ধরুন তো···এখুনি বলছি।

কিশন : (নোট ধরে) বলো ?

শরণ : আপনার কথাও না, আপনার কথাও না। উনিশ হাজার সাড়ে সাত শো।

(চোপড়া আর কিশনদেবী একসঙ্গে বলে।)

চোপড়া : না সর্দারজী না।

কিশন : না না, কম হবে না।

শরণ : চোপড়া সাহেব, একটু চুপ করুন। বৌদি শুনুন, ঘরের লক্ষ্মী ফেরাতে নেই। লক্ষ্মী এসেছে, লক্ষ্মী। আড়াইশো টাকা আর কি? ভেবে দেখুন।

কিশন : কি সুদর্শন? তোর কি মত।

শরণ : ও বেচারা কি বলবে। আজই বিকেলে রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে যা লেখালেখি করার করে নিতে হবে।

চোপড়া : হ্যাঁ হ্যাঁ। যখন খুশী লেখাপড়া করে নিন।

শরণ : চোপড়া সাহেব। আপনি আমার উপর একটু দয়া করুন। দালালীর অর্ধেক টাকা এখনই দিয়ে দিন আমায়। ঘরে র‍্যাশান তুলতে হবে আবার আজই। রেখেছিলাম চোপড়া সাহেবের কাজ হয়ে গেলে এটা করব।

কিশন : তুমিও বেশ লোক। ঘুরে ঘুরে, বলে বলে শেষ অবধি বাড়ীটা বিক্রী করিয়ে দিয়ে তবে তোমার শান্তি।

শরণ : এটাতো আমার রোজকার কাজ বৌদি। কথায় বলে না হুকুম করবে গরমে, দোকান করবে নরমে আর দালালী করবে বেশর্মে।

(সবাই হাসে)

(পর্দা)

ভাগিয়ে আনা মেয়ে

—কপূর সিং ঘুম্মণ

চরিত্র-লিপি

খড়কু : একজন জাট

বিরসা : খড়কুর বন্ধু

কর্তারো : খড়কুর বৌ

জীতা : খড়কুর ছেলে

সলমা : ভাগিয়ে আনা মেয়ে

থানাদার এবং সিপাই

স্থান : অমৃতসরের অজনালা তহশীলে পাকিস্তানী সীমান্তের কাছে একটি গ্রাম—ফত্তুবাল

সময় : জানুয়ারী, ১৯৪৯-এর এক সকাল

[খড়কুর ঘর। কাঁচ্চা বাড়ী, সামনে দুটো দরজা, ডানদিকে রান্নাঘর, বাঁয়ে ঘরের পেছনে আরও একটা ছোট ঘর। বাইরে থেকে আসার জন্যে রান্নাঘরের সঙ্গে আর একটা দরজা।

ঘরের এক দরজার সামনে কাঠের চরখা, পিঁড়ি, ঝুড়ি ইত্যাদি। আট বছরের ছেলে জীতা বসে বসে আখ চুষছে। ওর সামনে ডাঁই করে পড়ে আছে আখ। সামনে ছড়িয়ে আছে আখের ছিবড়ে। রান্নাঘর আর ঘরের মাঝে ঘড়া রাখা রয়েছে। পাশেই দুটো মোড়া। একটা উনুনও রয়েছে। কিছু এঁটো বাসন, কৌটো পড়ে। ঘরের দরজার সামনে এক খাটিয়ায় একটা বাচ্চা শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কাছেই অন্য একটা খাটিয়া। কর্তারো দুধের বালতী নিয়ে ভেতরে যায়।]

কর্তারো : ওরে জীতু, তোর আখ খাওয়া এখনও শেষ হলো না।

জীতা : ওটা শেষ হয়ে গেছে (হাতেরটা দেখিয়ে) এটা কিছুতেই শেষ হচ্ছে না।

কর্তারো : উঃ যেন আকালের দিনে জন্মেছিস। জন্ম হ্যাংলা। সারাদিন মুখ চলছে।

জীতা : বাবা যে এত্তো আখ খায়, ওকে তো কিছু বলো না।

কর্তারো : কাজও তো দশ জনের করে—একা করে সব। তোমার মতো শুধু খাইখাই করা ওর কাজ নয়। (রান্নাঘরে বালতি রাখতে যায়)

জীতা : বাবার মতো বড়ো হলে আমিও কাজ করবো।

কর্তারো : (বাইরে বেরিয়ে) ওহ্, তোর কাজ তো সারা পৃথিবী দেখবে। স্কুলে গিয়ে তো রোজ মারপিট করে আসিস। স্কুলের পড়াই পুরো করতে পারিস না আবার ক্ষেতের কাজ একা করবি।

জীতা : দেখে নিও তুমি।

কর্তারো : আচ্ছা ঠিক আছে। তোর বাবা কূয়োর ওখানে রয়েছে, যা চট করে লস্যিটা দিয়ে আয় তো আর সঙ্গে দুটো রুটী আর একটু আচারও দিয়ে আয়।

জীতা : আমি ঘরে রয়েছি, তুমি দিয়ে এসো।

কর্তারো : আহ্ ওঠ না দেখি। কোথাকার জমিদার নন্দন এসেছে। (ভেতরে যায়)

জীতা : দাও—রুটী আচার। (আখ চুষতে থাকে)

কর্তারো : (বাইরে এসে কাপড়ে ধরা তুটো রুটী আর লস্যির ঘটিটা রাখে) তুয়েকবার বল্লে তোর কানে যায় না। কি ভদ্রলোকের মতো কথা শুনবি, না অন্য রাস্তা দেখবো কাজ করাতে।

জীতা : ক্ষিদে পেয়েছে আমার।

কর্তারো : (হাত ধরে) মাখন দিয়ে রাতের বাসী রুটী তো এক্ষুণি খেলি, আট-দশটা আখও সাবাড় করলি—গোবর কোথাকার। ওঠ্, তাড়াতাড়ি যা।

(কর্তারো জীতার আখটা দূরে ফেলে দেয়। জীতা ঠোঁট ওল্টায়। মাথায় রুটী আর হাতে ঘটি নিয়ে বেরিয়ে যায়)

জীতা : (দরজা থেকে) আমার ফেরার আগে সব আখ শেষ করে রেখ না যেন।

কর্তারো : এখুনি ব্যবস্থা করছি আখের। যা দৌড়ে, বাপ ওদিকে পথ চেয়ে আছে।

(জীতা বাইরে যায়। কর্তারো সব নোংরা পরিষ্কার করে। ভেতর থেকে তুধ নিয়ে এসে ঘড়া থেকে জল নেয়—সব গুছিয়ে রাখে। চরখায় বসে সূতো কাটতে থাকে। বিরসা সিং আসে, হাঁফাচ্ছে সে।)

বিরসা : বৌদি, দাদা কি ঘরে?

কর্তারো : না। সব ভাল তো? তুমি আজ এদিকে হঠাৎ?

বিরসা : উত্তরের গাঁয়ে পুলিশ এসেছে।

কর্তারো : ওখানে তো মদ চোলাই করে ভীষণ তাই বোধ হয়?

বিরসা : পুলিশ মদের জন্যে আসেনি।

কর্তারো : তাহলে কিসের জন্যে এসেছে?

বিরসা : ভাগিয়ে আনা মেয়েদের বের করতে।

কর্তারো : ভাগিয়ে আমা মেয়েদের জন্যে?

বিরসা : হ্যাঁ, সঙ্গে মিলিটারী ট্রাকও এসেছে। যে মেয়েদের নামে

নালিশ হয়েছে তাদের ধরে পাকিস্থানে ফেরৎ পাঠাচ্ছে।

কর্তারো : তাতে তোমার ঘাবড়াবার কি আছে ?

বিরসা : বৌদি, শেরু আছে না, ঐ উত্তরের গাঁয়ের। ওকেও পুলিশ ধরেছে।

কর্তারো : কেন ?

বিরসা : ও ফজলদীন মুচীর মেয়েকে কোথায় বিক্রী করে এসেছে কে জানে।

কর্তারো : তাহলে তো ঠিকই হয়েছে। মেয়েদের জন্তুর মতো বিক্রী করা কি খুব ভাল কাজ নাকি ?

বিরসা : কিন্তু সঙ্গে নির্দোষ লোকেদেরও তো রগড়াচ্ছে। যে মেয়েগুলো পাকিস্তানে যেতে চাইছে না তাদেরও জবরদস্তি পাঠিয়ে দিচ্ছে।

কর্তারো : কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ? তুমিও কাউকে ভাগিয়ে এনেছ নাকি ?

বিরসা : ধর্ম্মের নামে বলছি, কাউকে ভাগাই নি। ভগবানই জানেন সব। একটা মেয়ের অবশ্য প্রাণ বাঁচিয়েছি। মৃত্যুর মুখ থেকে কাউকে বাঁচানো যদি পাপ হয় তাহলে আমি নিশ্চয়ই পাপী।

কর্তারো : তাহলে ভয়ের কি আছে ? কোনো লুটপাট লেগেছে নাকি—যাকে পাচ্ছে ধরে নিচ্ছে।

বিরসা : না না নিজে থেকে ধরছে না। যদি গাঁ থেকেই কেউ নালিশ করে আসে তাহলে পুলিশ এসে ধমকাচ্ছে।

কর্তারো : সত্যেরই শেষ অবধি জয় হয় বিরসা।

বিরসা : তোমার কথাটা ঠিক, কিন্তু চাক্কীর মধ্যে পড়লে আনাজও পিষে যায়।

কর্তারো : ঠিক করে বলোতো ব্যাপারটা কি ?

বিরসা : এখন আমার সম্মান আর একটা মেয়ের জীবন-মরণের প্রশ্ন।

কর্তারো : তোমাকে আমি নিজের দেওরের মতোই দেখি। আমার কাছে লুকিও না কিছু।

বিরসা : বহু চেষ্টা করে এখান পর্যন্ত পৌঁছেছি।

কর্তারো : সাহস রাখো, মান যাবে না।

বিরসা : (খাটে বসে) সলমা পাকিস্তানে যেতে চায় না। আর আমাকে যদি পুলিশে ধরে তাহলে ওর মাথা গোঁজারও ঠাঁই নেই।

কর্তারো : সলমা কে?

বিরসা : ঐ গাঁয়ের সতরুর মেয়ে—সেই গণ্ডোগোলের সময় যে গুণ্ডাদের হাতে পড়েছিল।

কর্তারো : (সজল নয়নে সলমার যা হয়েছে ভগবান তা যেন আর কাউকে না করেন। মনে করলে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

বিরসা : রাওলপিণ্ডী থেকে যারা এসেছে তারা যা বলত আমার বিশ্বাস হতো না। আশেপাশের বাড়ীর মেয়েদের ধরে লাইনবন্দী নিয়ে যাওয়া, ওদের গরু-ভেড়ার মতো বিক্রী করা, কাটা এসব ভীষণ খারাপ লাগত শুনে। কিন্তু সলমার এসব সহ্য করতে হয়েছে আমারই সামনে।

কর্তারো : তোমার সামনে? আর তুমি চুপচাপ তাই দেখলে? তুমি বদমাসগুলোকে বাধা দাও নি, ওদের হাত-পা ভেঙে দাও নি।

বিরসা : আমার উপায় থাকলে ওদের ছাড়তাম না। কিন্তু মারখাওয়া সাপের মতো বিষ ওগরানো ছাড়া আর কিছু করার ছিল না আমার। এই দেখো (জামা তুলে দেখায়) সলমার ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে ঐ বদমাস পাগলগুলোর কাছ থেকে পাওয়া চিহ্ন। ওরা আমায় প্রচণ্ড মেরেছে, শেকল দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে অত্যাচার করেছে। সলমার বাপ-ভাইয়ের সামনেই ওরা সব করেছে—সব—সে সব আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না। কোনো বাপ, কোনো ভাই স্বচক্ষে তা দেখতে পারে না।

ওরা সলমার মাংসগুলো খাবলে নিচ্ছিল পাগলা কুকুরের মতো, ক্ষুধার্থ শকুনের মতো। সলমার নারীত্বকে চিরদিনের মতো শেষ করে দিয়েছে ওরা।

(কর্তারো চোখ মোছে।)

কতবার ওকে বিক্রী করলো, কি দুর্ব্যবহার করেছে ওর সঙ্গে।

তারপর এক সময় ওকে ছুঁড়ে ফেলেছে এক ধারে।

গত রবিবার আমি পশুদের খাবার নিয়ে লালুবান গাঁয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম—হঠাৎ কার কূয়োয় পড়ার আওয়াজ পাই। মাথার বোঝা নামিয়ে রেখে কূয়োয় ঝুঁকে দেখি একটা শরীর ছটফট করে ডুবছে। আমিও লাফালাম কূয়োয়, ডুবন্ত একটা মেয়েকে তুললাম। তুলে দেখি অবাক কাণ্ড—এতো সলমা।

কর্তারো : সলমা ?

বিরসা : ওর হুঁশ ছিল না তখন। জ্ঞান ফিরতেই আবার কূয়োর দিকে দৌড়ে যায়, আমি আটকালাম ওকে। বল্লাম, 'এখন কোথাও যেতে পাবে না সলমা। আমি তোমায় বাঁচাব। তোমার বাপের, ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেব তোমায়'। কিন্তু ও বাঁচতে চায় না। ও প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়ছিল, আমার হাতে কামড়ে দিল। কিন্তু আমি ওকে ছাড়িনি।

কর্তারো : তারপর ?

বিরসা : আমি বল্লাম, সলমা, এই পৃথিবীতে তোমার উপর যত অত্যাচার হয়েছে তার সব প্রতিকার করব। তোমার সঙ্গে যারা খারাপ ব্যবহার করেছে তাদের মাথা কেটে তোমার পায়ের কাছে রেখে দেব। তোমার মাংস খাবলে নিয়েছে যারা তাদের মাথায় তোমার জুতোর বাড়ি পড়বে। আমি তোমার হাত ধরেছি। তোমার ভাই হয়ে, তোমার স্বামী হয়ে। যে ভাবে চাও স্বীকার করে নাও আমাকে। তোমার জন্যে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি আমি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করে দেখ একবার।

কর্তারো : ও মেনে নিলো এসব ?

বিরসা : মেনে নিয়েছে কিন্তু একটা শর্ত আছে।

কর্তারো : কি শর্ত ?

বিরসা : কারো ওপর বদ্‌লা নেওয়া চলবে না, কাউকে খুন করা চলবে না। ওর সঙ্গে যারা দুর্ব্যবহার করেছে দোষটা নাকি আসলে তাদের নয়।

কর্তারো : তাদের নয় ?

বিরসা : হ্যাঁ। কে জানে ওর মনটা কিসের তৈরী? যারা ওর শরীরটাকে এভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে তাদের রক্তধারা ও দেখতে চায় না। ও সাজা দিতে চায় না। বলে, ওদের ভীষণ লজ্জা দেব। সাতপুরুষ অবধি আমার সামনে মাথা তুলে হাঁটতে পারবে না'। আমি সলমার এই স্বপ্নকে সত্য করতে চাই। কিন্তু ভয় হয়, পুলিশ না জানতে পারে ওর খবর। এখন তোমার আশ্রয় ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না বৌদি।

কর্তারো : আমি তোমাকে পুরোপুরি সাহায্য করবো।

বিরসা : কেউ জানে না সলমা আমার কাছে আছে। কিন্তু কথা আছে না—দেওয়ালেরও কান আছে।

কর্তারো : হ্যাঁ, লোকদের থেকে সামলে থাকাই ভাল।

বিরসা : লোকে শত্রুতা করে মিথ্যে রিপোর্ট করে আসে। আর আমার তো সারাটা গাঁই শত্রু।

কর্তারো : তাহলে কি করবে এখন?

বিরসা : দুয়েক দিন তো সলমা এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। পুলিশ চলে গেলে ওকে নিয়ে যাব আমি।

কর্তারো : তুমি ভেবো না, আমি ওকে ঠিক সামলে রাখব।

বিরসা : দাদাও যেন না জানে।

কর্তারো : সেটা তো মুশকিল। ওর পরামর্শ বিনা···

বিরসা : সলমার জন্যে এটুকু তোমায় করতেই হবে বৌদি।

কর্তারো : ঠিক আছে। কথা দিচ্ছি।

বিরসা : তাহলে গিয়ে সলমাকে পাঠিয়ে দিই?

কর্তারো : কিন্তু আসার সময় কেউ যদি দেখে ফেলে।

বিরসা : সে চিন্তা কোরো না। ও আখের ক্ষেতে লুকিয়ে আছে। আর ওখানে পাশেই আখ বিছানো রয়েছে উঁচু করে। তুমি একটা কাপড় দাও আমাকে। ওকে মাথায় আখ নিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার ঘর জানে ও।

কর্তারো : হ্যাঁ, সেই ভাল। আখের বোঝার তলায় কেউ ওকে চিনতে পারবে না। (খাট থেকে চাদর তুলে) নাও, কাপড়টা নিয়ে যাও।

বিরসা : এবার তোমার কথা রেখ বৌদি, পরে ডুবিও না আমায়।

কর্তারো : চিন্তা কোরো না। ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন বিরসা ভাই।

(বিরসা সাশ্রুনয়নে কর্তারোর দিকে তাকায়, ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে)

কর্তারো : এতটা বোঝা আমার ওপর দিও না ভাই।

বিরসা : তোমার ভালবাসা, সাহায্য জীবনভোর মনে রাখব বৌদি। (প্রস্থান। কর্তারো দুধটা নাড়াচাড়া করে গিয়ে পিঁড়িতে বসে ভাবনায় ডুবে যায়। জীতা এলে ঘটিটা রেখে দেয়। জীতা ঘাবড়ে আছে)

জীতা : মা, বাইরে পুলিশ এসেছে!

কর্তারো : পুলিশ?

জীতা : হ্যাঁ, (কাঁদো কাঁদো মুখে) বাচ্চু বলছে আমার মা বাবাকে ধরার জন্যে এসেছে!

কর্তারো : তোর বাবাকে আর আমাকে? বাচ্চুকে কে বললো?

জীতা : ওর কাকা বলেছে।

কর্তারো : এমনি, তোকে ভয় দেখাচ্ছিল বাবা আমাদের কেন ধরবে? তুই বললে পারতিস যে তোমার কাকাকেই ধরবে।

জীতা : বাচ্চু আমায় মারে, আমি পুলিশকে বলে দেব। বাচ্চুর কাকা মদ চোলাই করে—ওরা ওকে ধরবে, না?

কর্তারো : কাউকে ধরবে না।

জীতা : হ্যাঁ, আমি যেন জানি না। নাহামাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল—জেল দিয়েছে ওর। ও মদ বানাতো। এখন তো জেলে ঘানি টানছে।

কর্তারো : বাজে বোকো না। বাবার রুটি দিয়ে এসেছিস তো?

জীতা : দিয়েছি, কিন্তু খেলো না।

কর্তারো : খায়নি কেন?

জীতা : কে জানে লস্যি খেয়েই লম্বরদারের কূয়োর দিকে দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল।

কর্তারো : আর রুটীগুলো ?

জীতা : বললো, বলদদের খাইয়ে দিতে—খাইয়ে দিলাম।

কর্তারো : আর কিছু হয়নি তো ?

জীতা : না।

কর্তারো : (চিন্তা করে) তোর বাবা জানে গাঁয়ে পুলিশ এসেছে ?

জীতা : আমি কি জানি।

কর্তারো : এখন কোথায় রয়েছে পুলিশরা ?

জীতা : গুরদ্বারাতে দাঁড়িয়ে আছে। রক্খা চৌকিদার ওদের জন্যে খাটিয়া নিয়ে গেল।

কর্তারো : গিয়ে শোন তো, কি বলাবলি করছে ওরা ?

জীতা : না বাবা ! আমাকে ধরে নেবে। আমি অতি কষ্টে অন্য গলি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছি।

কর্তারো : না না, তোকে ধরতে পারবে না।

জীতা : আমার পুলিশকে ভীষণ ভয় লাগে। ক্ষিদে পেয়েছে আমার।

কর্তারো : ওহ্ জ্বালাতন ! পেটে তোর রাক্ষস আছে নাকি ?

জীতা : মা একটু আখ খাব ?

কর্তারো : খা যত খুশী খা। আমি অন্য কাউকে পাঠাই গুরদুয়ারয়ে।

(জীতা বসে আখ খেতে থাকে। কর্তারো পিঁড়িতে বসে। সিপাই আসে। জীতা ভয় পেয়ে যায়)

জীতা : মা, পুলিশ ! (আখ ফেলে এক দৌড়ে ঘরে পালায়। কর্তারোর মুখও ফ্যাকাশে হয়ে যায়)

সিপাই : এটা খড়ক সিংয়ের বাড়ী ?

কর্তারো : হ্যাঁ।

সিপাই : ও কোথায় ?

কর্তারো : কূয়োর দিকে গেছে।

সিপাই : এ ঘরে তো আর কেউ থাকে না ?

কর্তারো : না।

সিপাই : তাড়াতাড়ি খড়ক সিংকে ডেকে আনো তো।

কর্তারো : কি ব্যাপার?

সিপাই : সেটা ওকেই বলব।

কর্তারো : ও তো কখনো কোনো অন্যায় করেনি। মারপিট, লুট-দাঙ্গা করেনি। মদও চোলাই করে না। ওকে বলবেন?

সিপাই : বললাম তো তাড়াতাড়ি খড়ক সিংকে ডাকো। তারপর সব বলছি।

কর্তারো : জীতু, ওরে জীতু।

সিপাই : (রেগে গিয়ে) এই ব্যাটা জীতু, বাইরে আয়।

(ভয়ে ভয়ে জীতু বাইরে এসে হাত জোড় করে)

জীতা : আমি কখনো মদ খাইনা সিপাইজী, আমি আখ খাই শুধু।

সিপাই : যা তাড়াতাড়ি তোর বাবাকে ডেকে আন।

জীতা : বাবাও মদ খায় না। বৈশাখীর দিনও না।

সিপাই : আবে শালা। বলছি ডেকে নিয়ে আয় বাপকে। তাড়াতাড়ি যা।

জীতা : এই যাচ্ছি যাচ্ছি।

সিপাই : দৌড়ে যা। দৌড়ো। দেরী করলে মার খাবি।

(জীতা সিপাইয়ের দিকে দেখে)

সিপাই : আরে, এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ!

জীতা : গুরদুয়ারায় আরও পুলিশ রয়েছে, আমায় ধরে নেবে।

সিপাই : কেউ ধরবে না তোকে। যা দৌড়ে যা।

(জীতা দৌড়ে বেড়িয়ে যায়)

কর্তারো : জমাদ্দার সাহেব লস্যি খাবেন ?

সিপাই : তা দাও, খাই আর কি করা যায়।

কর্তারো : খাটে বসুন না।

(কর্তারো রান্না ঘরে যায়। সিপাই খাটে বসে এদিক-ওদিক দেখে। কর্তারো লস্যি এনে দেয়, মাখন ভাসছে)

সিপাই : খড়ক সিং তোমার কি হয়?

কর্তারো : আমার স্বামী।

সিপাই : তোমার নাম কি ?

কর্তারো : আজ্ঞে, কর্তার কাউর।

সিপাই : (লস্যি খেয়ে) পাশের গাঁয়ে মেয়েদের গ্রেপ্তার করেছি।

কর্তারো : দুজন মেয়েকে ?

সিপাই : হ্যাঁ, এখানেও একজনের খবর পেয়েছি।

কর্তারো : কি করে ?

সিপাই : গ্রাম থেকেই কেউ রিপোর্ট করেছে। আমরা তো স্বপ্নে পাই না।

কর্তারো : এখানে কোন মেয়ে।

সিপাই : থানাদার বলবে এক্ষুণি ! আমি বলতে পারি না। (ব্যঙ্গের স্বরে) এখানে তো কেউ নেই।

(দরজায় শব্দ। কর্তারো ঘাবড়ে গিয়ে দরজার কাছে যায়। জীতা আসে)

কর্তারো : আশ্চর্য, যাসনি তুই।

জীতা : পুলিশকে ভয় লাগছে।

সিপাই : পুলিশ তো ভূত নয়রে শূয়োর। চল তোকে পেঁছে দিচ্ছি। কর্তার কাউর খড়ক সিং এলেই বাইরে গুরদুয়ারায় পাঠিয়ে দিও।

জীতা : যে আজ্ঞে।

(জীতা আর সিপাই বেরিয়ে যায়। সলমা আখের বোঝা নিয়ে ভেতরে আসে। কর্তারো তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে শেকল দেয়। সলমা বোঝা নামিয়ে এদিক-ওদিক দেখে।

কর্তারো : ভগবান বাঁচিয়েছেন সলমা। একটু আগে এলেই সব হয়ে গেছিল আর কি!

সলমা : আমার বুকটা এখনো কাঁপছে। এর থেকে কাপাসের ক্ষেতে রয়ে গেলেই ভালো হতো।

কর্তারো : আর চিন্তা কোরো না। তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না।

সলমা : পুলিশ সব ঘর তল্লাসী চালাবে।

কর্তারো : হ্যাঁ, এখানে তো আসবেই।

সলমা : তাহলে কি হবে এখন!

কর্তারো : এই ঘরের পেছনে আর একটা ছোট ঘর আছে। ওতে অনেক খড় জমা করা আছে। তুমি ওর পেছনেই লুকিয়ে যাও। তোমার ওপরও খড় চাপা দিয়ে দেব।

সলমা : চলো দিদি, তাড়াতাড়ি করো পুলিশকে ভীষণ ভয় লাগে।

কর্তারো : একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

সলমা : তাড়াতাড়ি করো

কর্তারো : তুমি তোমার মা-বাবার কাছে চলে যাওনা কেন— পাকিস্থানে?

সলমা : (চমকে ওঠে) কি বলছো দিদি? কি ভেবেছ তুমি? তুমি আমাকে···

কর্তারো : না না। সে কথা নয়। আমি বিরসা সিংকে কথা দিয়েছি যে তোমাকে পুরো পাহারা দেব। তোমার কথা শুনে ভীষণ খারাপ লাগছিল। ভাবলাম জিজ্ঞেস করেই দেখি তুমি নিজের ইচ্ছায় এখানে থাকতে চাও নাকি?

সলমা : মা-বাবার কাছে কোন মুখে আর যাবো? ওদের চোখের দিকে তাকাবো কি করে? কে বিয়ে করবে আমায়। কে স্বীকার করে নেবে আমার পাপের বোঝাটাকে? কোন শ্বাশুড়ী আমায় আদর করবে? কোন ননদ না আমায় খোঁটা দেবে। কোনো আত্মীয় আমায় নাক কাটতে বাকী রাখবে? কোন বাচ্চা আমার মতো মাকে সম্মান করতে, ভালোবাসতে পারবে?

কর্তারো : এতে তোমার কি দোষ? আর এখানে থেকেই বা কি আদর পাবে ভাবছ?

সলমা : আমি বাঁচতে চাই না। তবু কিছুদিন যে বাঁচতে হবেই।

কর্তারো : কেন?

সলমা : পেটের মধ্যে তিল তিল করে বড়ো করে তোলা এই কলঙ্কের বোঝাটা আমি ওদের মাথায় চাপিয়ে দেব—যাদের ফল এটা।

ওদের বৌ-বাচ্চারা এই কলঙ্কের দিকে আঙুল দেখিয়ে ওদের বেইজ্জতি করবে। ওদের ভদ্রতার চাদরে পাপের কলঙ্ক লাগবে।

কর্তারো : তুমি হীরের টুকরো মেয়ে সলমা, তোমার জন্যে সব কিছু করতে পারি আমি।

সলমা : তাড়াতাড়ি লুকিয়ে দাও আমায়। পরে কথা হবে।

কর্তারো : চলো ভেতরে চলো।

(কর্তারো আর সলমা ঘরের মধ্যে চলে যায়। বাইরের দরজায় করাঘাত। কর্তারো ঘাবড়ে গিয়ে বাইরে আসে। ঘরের শিকল তুলে বাইরের দরজা খোলে)

খড়ক : সিপাই এসেছিল বাড়ীতে ?

কর্তারো : হ্যাঁ। জীতার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

খড়ক : না।

কর্তারো : সব ঠিক আছে তো ? পুলিশ কি চায় কে জানে ?

খড়ক : লম্বরের কাছে গিয়েছিলাম, দেখা পেলাম না। বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কি ?

কর্তারো : কে রিপোর্ট করে দিয়েছে ?

খড়ক : আমাদের নামে কেউ কেন রিপোর্ট করতে যাবে ?

কর্তারো : মিথ্যে কথাও তো লোকে বানায়।

(থানাদার ও সিপাইয়ের প্রবেশ)

থানাদার : তোমার নাম খড়ক সিং ?

খড়ক : আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন, এই খাটে বসুন না।

থানাদার : বসার সময় নেই। এ কে ?

খড়ক : আজ্ঞে, কর্তার কাউর। আমার বৌ, মানে স্ত্রী।

থানাদার : (ব্যঙ্গের স্বরে) স্ত্রী ? হুঁ ! এর আগে কি ছিলো ?

খড়ক : বিয়ের আগের কথা বলছেন ?

থানাদার : হ্যাঁ, এ কোন গাঁয়ের ?

খড়ক : আজ্ঞে, ঠিকরিওয়ালের।

থানাদার : (খুশী হয়ে) বলেছি না, দেখলে তো। এর বাপের নাম কি ?

খড়ক : (ভীত হয়ে) কিন্তু এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

থানাদার : যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দাও। এর বাপের নাম কি ?

খড়ক : আমি ঠিক জানি না আজ্ঞে।

থানাদার : ঠিক করে বলো নয় তো তোমাকেও ধরে নিয়ে যাবো।

খড়ক : আমাকে ?

থানাদার : নয় তো কি ? আমার সঙ্গে চালাকি ? বলো, তোমার বউ কর্তারো, নুরদীন লুহারের মেয়ে বরকতে নয় ?

খড়ক : কিন্তু, আজ্ঞে আমাদের বিয়ের···

থানাদার : তোমার বিয়ের নিকুচি করেছে। হ্যাঁ কি না জবাব দাও। বলো এ নুরের মেয়ে বরকতে ?

খড়ক : আজ্ঞে তাই ছিলো। কিন্তু পরে ও অমৃত ছক নিয়েছিলো।

থানাদার : অমৃত ছক তো সবাই নেয়। কিন্তু আমাদের কাছে হুকুম আছে একে পাকিস্থানে ওর মা-বাপের কাছে পেঁৗছে দেওয়ার।

খড়ক : কিন্তু আজ্ঞে, ও তো দশ বছর ধরে আমার ঘরে। ওরই ছেলে আমার—জীতা, আট বছর বয়স।

থানাদার : এসব কথার ফয়সালা থানায় হবে। তোমার গ্রাম থেকেই রিপোর্ট হয়েছে। কর্তারো ভাগিয়ে আনা মেয়ে।

খড়ক : (অবাক হয়ে) ভাগিয়ে আনা মেয়ে ?

কর্তারো : (মিনতি করে) আমি ভাগিয়ে আনা নই, বিশ্বাস করুন। হুজুর কোনো বদমাস মিথ্যে বলেছে। আমি ভাগিয়ে আনা নই। আমার মা-বাবা সব জানে। আমি নিজের ইচ্ছাতেই···

থানাদার : বেশী কথা বলিস না ছিনাল। চারদিন জাঠের ঘর করে চৌধুরানী হয়ে গেছিস। ফৌজা সিং, ওঠাও একে ট্রাকে।

(ফৌজা সিং সিপাই সেল্যুট করে কর্তারোর হাত ধরে। কর্তারো ছাড়াবার চেষ্টা করে, কাঁদে। খাটে ঘুমন্ত বাচ্চাটা জেগে উঠে কাঁদে। থানাদার নিজের কালো ডাণ্ডাটা পায়ের ওপর বোলাতে থাকে। খড়ক নির্বাক হয়ে থানাদারের দিকে তাকিয়ে থাকে)

সিপাই : বাচ্চাটাও এর ?

থানাদার : উঠিয়ে নাও ওকেও, ওর কোলে দিয়ে দাও। আবার

আসতে না হয় এর জন্যে।

খড়ক : (হাত জোড় করে) আজ্ঞে আমায় দয়া করুন হুজুর। আমরে ঘর শ্মশান হয়ে যাবে।

থানাদার : (রাগে গর্জন করে) বাচ্চা উঠিয়ে মেয়েটার কোলে দাও তাড়াতাড়ি।

(খড়ক চোখ মুছে বাচ্চাটা তুলে দেয়। কর্তারো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। পর্দা)

ক্যাটল

—হরসরণ সিং

চরিত্র-লিপি

মিস্ গুরচরণ : বয়স চব্বিশ বছর
মিস্ রাজিন্দর : বয়স তেইশ বছর
মিস্টার সন্ধু : বয়স চব্বিশ বছর

(লম্বা ছিপছিপে চেহারার মিস্ গুরচরণ—এ্যাটাচি কেসে কাপড় রাখছে। ঘরের একদিকে দুটো ট্রাঙ্ক এমন করে রাখা যেন ওগুলো বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। একটা টেবিলের দুদিকে দুটো চেয়ার। ডান দিকে দেওয়াল ঘেঁসে আরও দুটি চেয়ার রাখা। কার্নিসে রাখা ছবিতে মিস্ গুরচরণ ও মিস্ রাজিন্দর দুজনে একে অন্যের গলায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে। ঠাণ্ডার জন্যে বাইরের দরজা-জানালা বন্ধ। কিছুক্ষণ পরে লম্বা ছিপছিপে চেহারার মিস্ রাজিন্দর তাড়াতাড়ি বাইরে থেকে আসে। ওর জামা-কাপড় একেবারে গুরচরণের মতোনই। মিস্ গুরচরণ কাজ রেখে ওর দিকে এগিয়ে আসে)

রাজিন্দর : বেশী সময় নিই নি তো ?

(কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখে)

গুরচরণ : (একটু হেসে) বহু দেরী করেছ সখী।

রাজিন্দর : সব মিলিয়ে আধঘণ্টা লাগলো।

গুরচরণ : না, অর্ধেক জীবন লাগলো।

রাজিন্দর : চন্নী! (জড়িয়ে ধরে ওকে)

গুরচরণ : (কাঁদো কাঁদো স্বরে) তোকে ছাড়া ওখানে বাঁচবো কি করে ?

রাজিন্দর : ঘাবড়াস না। আমিও তোর সাথে যাচ্ছি।

(গুরচরণ চট করে সরে আসে)

গুরচরণ : তুই···আমার সাথে···যাচ্ছিস··· (খুশীতে) হ্যাঁরে প্রিন্সিপাল মত দিয়েছে নাকি ?

রাজিন্দর : না, চাকরী ছেড়ে দিলাম।

গুরচরণ : (আশ্চর্যের স্বরে) ছে—ড়ে দিলি ?

রাজিন্দর : প্রিন্সিপালকে সোজা বল্লাম গুরচরণ আমাকে ছাড়া বাঁচবে না, আমিও ওকে ছাড়া বাঁচবো না।

গুরচরণ : কিন্তু চাকরী ছেড়ে···।

রাজিন্দর : (বাধা দিয়ে) ও বললো, বিশ্বাস হচ্ছে না।

গুরচরণ : তুই চুপ থাকলেই পারতিস।

রাজিন্দর : আমি বল্লাম, হাতে নাতেই প্রমাণ রয়েছে। এই নিন রেজিগনেশন লেটার।

গুরচরণ : পাগ্‌লী! তুই বেশী তাড়াহুড়ো করেছিস কিন্তু। চাকৃরীটা ছাড়া…

রাজিন্দর : (কাঁদো কাঁদো স্বরে) কি, আমার চন্নী, আমাকে রুটীও খাওয়াতে পারবে না।

গুরচরণ : আমার কাছে তুই একটা ফুল চাইলে আমি তোকে বাগান উজাড় করে দিতে পারি।

রাজিন্দর : আমার চন্নী। লক্ষ্মী চন্নী!!

গুরচরণ : তুই রিজাইন না করলে ওখানে গিয়ে হয় তো আমার প্রথম কাজও এটাই হতো। তুই যাওয়ার পর আমি তিনবার কেঁদেছি।

রাজিন্দর : (সহাস্যে) পাগলী।

গুরচরণ : তুই আমাকে ছেড়ে কখনো যাসনি।

(দুজনেই চেয়ারে বসে)

রাজিন্দর : প্রিন্সিপাল আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে বললো (নকল করে) ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার, আজ এই প্রথম একলা পাখি দেখলাম। জোড়া কোথায়? কি চলে গেছে নাকি এখান থেকে?

গুরচরণ : (সক্রোধে) তোরও এমন ঝাড়া উচিত ছিল যে ও জ্বলে পুড়ে…

রাজিন্দর : (বাধা দিয়ে) আমি চুপ ছিলাম, কেননা একটা আর্জি নিয়ে গেছি তো।

গুরচরণ : আমি ঠিক জানি ও হিংসেয় আমার বদলী করিয়েছে।

রাজিন্দর : আমি যখন বল্লাম যে আমারও মিস্ গুরচরণের সঙ্গে বদলী করে দিন তো, ও খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

গুরচরণ : তারপর?

রাজিন্দর : বলে কি মিস্ রাজ! তোমার আর মিস্ গুরচরণের ফ্রেণ্ডশিপ আশ্চর্য।

গুরচরণ : আমার আন্দাজ ঠিক—ওর হিংসেতেই···

রাজিন্দর : (বাধা দিয়ে) আরও বললো, বলে 'মোস্ট আন্‌ন্যাচারাল' এটা খুবই আশ্চর্যের।

গুরচরণ : এটা সাইকোলজির প্রফেসর বলেছে, স্টুডেণ্টের মধ্যেও চালু করেছে এটা।

রাজিন্দর : আম্মা আরও মজা করলো, (নকল করে) আমি শুনেছি তোমার নাকি মিস্ গুরচরণের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে।

গুরচরণ : তোর বলে দেওয়া উচিত ছিলো, নিশ্চয়ই যখন দুটো মন—

রাজিন্দর : (বাধা দেয়) আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন 'এক মন দুই প্রাণ' প্রবাদটা কি স্বামী-স্ত্রীর জন্যেই নাকি ?

গুরচরণ : তারপরে ?

রাজিন্দর : কিন্তু ও আবার খিলখিলিয়ে হাসতে লাগলো। হাসি থামিয়ে ন্যাকান্যাকা করে বললো 'এক মন দুই প্রাণ', বলেই আবার হাসতে লাগলো।

গুরচরণ : (সক্রোধে) ডোমনী !

রাজিন্দর : আমার খুব রাগ ধরে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার অন্য মূর্তিটি কোথায় ?' শুনেই ওর হাসি একদম বন্ধ। বলল, (নকল করে) 'কোন মূর্তি ?' আমি বললাম, 'যার সঙ্গে পুরুত আপনাকে সাত পাকে বেঁধেছিল ?'

গুরচরণ : (উৎসাহিত হয়ে) শাবাস ! (ওকে পাশে টেনে) তুই আমাকে যা খুশী করেছিস না কি বলবো !

রাজিন্দর : নেকীটার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, উত্তর যোগাল না মুখে। থেমে থেমে বললো (নকল) ও···ও···আমি আর ও···প্রায় চার বছর আগে থেকে···আলাদা হয়ে গেছি। (দুজনেই হাসে)

গুরচরণ : (ব্যঙ্গ ভরে) এক মন দুই প্রাণ !

রাজিন্দর : তারপর আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "ম্যাডাম ; মিস্ রচরণ আর রাজ সব সময়ের জন্যই এক। একসঙ্গে বাঁচবো, একসঙ্গে মরবো।"

গুরচরণ : সবার হিংসে। চল্, খাওয়া দাওয়া করে নিই।

রাজিন্দর : তুই এখনো খাসনি।

গুরচরণ : তোকে ছেড়ে কি করে খাবো। আগে কখনো খেয়েছি?

রাজিন্দর : (চিন্তিত স্বরে) তাড়াতাড়ি কর তাহলে। তোর তো বেশী ক্ষিদে পায়। পেট তো কুঁইকুঁই করছে নিশ্চয়ই।

(দুজনেই পেছনের ঘরের দিকে যায়। এক পা এগোতেই দরজায় খটখট আওয়াজ। দুজনেই দাঁড়িয়ে যায়। প্রথমে দরজার দিকে দেখে, পরে একে অন্যের দিকে)

রাজিন্দর : (জোরে) কে?

নেপথ্যে : (জোরে) সন্ধু নকিঙ্গ।

দুজনেই : (আশ্চর্য স্বরে) সন্ধু?

রাজিন্দর : সন্ধুটা কে?

গুরচরণ : আমি তো কোনো সন্ধুকে চিনি না।

(দরজায় আবার খটখট)

রাজিন্দর : দাঁড়া, জানলা দিয়ে দেখি কে?...কোনো অচেনা ছেলে, প্যাণ্ট, কোট, টাই, ফেল্ট!

গুরচরণ : অন্য কেউ দেখলে কি ভাবে বলতো? আগে তো কোনো ছেলে আমাদের ঘরে—

নেপথ্য থেকে স্বর : মিস্ সেখোঁ। আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকারে দেখা করতে এসেছি।

রাজিন্দর : (চটে গিয়ে) ননসেন্স। বিশেষ দরকারে দেখা করতে—

গুরচরণ : দেখ্ না কথা বলে। কি আর হবে এমন।

রাজিন্দর : ছাড়, কে জানে কোন লোফার।

নেপথ্য স্বর : মিস রাজিন্দর!

গুরচরণ : নে, এবার তোকে ডাকছে।

রাজিন্দর : কিন্তু একে তো আমি চিনিই না। এর চেহারাও আগে কোনোদিন দেখিনি।

গুরচরণ : তোর আত্মীয়-টাত্মীয় কেউ নয় তো?

রাজিন্দর : আমার কেউ আত্মীয় নেই, এক কাকা আছে যে

আমাকে মানুষ করেছে।

গুরচরণ : তোর এক ভাইও তো আছে, যে ইংল্যাণ্ডে গেছিলো।

রাজিন্দর : ও অনেক লম্বা। এ তো—

(আবার দরজা ধাক্কা)

গুরচরণ : চল্, দুজনে গিয়ে দেখি। বাঘ তো নয় যে খেয়ে ফেলবে।

(দুজনেই বাইরের দরজার দিকে যায়। দরজা খোলে। হাতে এ্যাটাচি কেস নিয়ে সন্ধুকে দেখা যায়)

সন্ধু : গুড্ ইভনিং।

গুরচরণ : মাফ করবেন, আপনাকে চিনতে পারলাম না।

সন্ধু : আমি সন্ধু। ইংল্যাণ্ড থেকে আসছি।

রাজিন্দর : ইংল্যাণ্ড থেকে ?

সন্ধু : আজ্ঞে হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ড থেকে। সেখোঁর খবর আর উপহার নিয়ে এসেছি।

রাজিন্দর : আপনি দাদার কাছ থেকে এসেছেন ?

সন্ধু : হ্যাঁ, সেঁখো আমার ফার্স্ট ফ্রেণ্ড।

রাজিন্দর : কি খবর দাদার ?

সন্ধু : সব ভালোই। কিছু জিনিস আপনার জন্যে...

(এ্যাটাচি মেঝেতে রাখে)

রাজিন্দর : আসুন, ভেতরে আসুন। প্রথমে দাদার খবর বলুন।

সন্ধু : (এ্যাটাচি নিয়ে ওদের পেছন পেছন ঘরে এসে তিন জনেই চেয়ারে বসে) সেঁখো মজায় আছে। নতুন ফ্ল্যাট নিয়েছে। এক মেমও বিয়ে করেছে।

রাজিন্দর : (আশ্চর্য হয়ে) বিয়ে করেছে ?

সন্ধু : হ্যাঁ লাভ ম্যারেজ। (হাসে) সেঁখো বলছিল আমার বোনকে বলিস যদি বিয়ে না করে থাকে তো করে নিতে। আপনি কি ম্যারেড ?

রাজিন্দর : না।

সন্ধু : (খুশী হয়ে) গুড।

গুরচরণ : এ বিয়ে করতে চায় না।

সন্ধু : নট এ ব্যাড আইডিয়া। আপনি মিস্ সেখোঁর. . ?

রাজিন্দর : ও আমার বোন।

সন্ধু : বোন, মানে নিজের বোন? সেঁখো যে বলে ওর একই বোন?

রাজিন্দর : যখন কেউ জীবনমরণে একই সাথে থাকে সে সহোদরের থেকেও বেশী।

সন্ধু : সত্যি। পুরো বার্মিংহাম আমাকে আর সেখোঁকেও সহোদর ভাই বলেই ভাবত। থাকা এক সঙ্গে, জামা-কাপড় একই রকম, এক সঙ্গে ঘোরা-খাওয়া সবকিছু। কিন্তু (সক্ষেদে) ও একদিন চুপচাপ বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেল।

গুরচরণ : ওর রোমান্স আপনি আগে থেকে জানতেন না ?

সন্ধু : উঁহু। ও তো ছিপা রুস্তম। কিন্তু আমি ওকে বলেছি, সেঁখো তুই বিয়ে করলি দেখিস আমিও করে নেব। এই শুনে ও খুশীতে ডগমগ। জিজ্ঞেস করলো, 'কোন মেমকে ?' আমি বললাম, 'মেমকে না। শীগ্‌গীরই পাঞ্জাব যাবো আর ওখানেই করব।'

গুরচরণ : তার মানে আপনি বিয়ে করতে এসেছেন ?

সন্ধু : হ্যাঁ, সে রকমই ইচ্ছে আছে।

গুরচরণ : আপনি কেন পিছিয়ে পড়লেন ?

সন্ধু : সেখোঁ আমায় রাগ ধরিয়ে দিয়েছিলো। (সবাই হাসে)

রাজিন্দর : আরে কথায় কথায় ভুলে গেছি। চা-টা খাবেন তো ?

সন্ধু : ন্ না কিছু না। আপনি আপনার জিনিস-পত্তরগুলো রাখুন, আমিও চলি। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ী—

গুরচরণ : কিছু না খেয়ে যেতেই দেব না। কি কফি না চা ? খাবারও তৈরী আছে।

সন্ধু : কিচ্ছু না। ব্যস্, এবার।

গুরচরণ : তাহলে ফলই খান। (ওঠে)

রাজিন্দর : তুই বোস চন্নী, আমি আনছি। (ওঠে)

গুরচরণ : একই কথা।

সন্ধু : আপনারা দুজনেই বসুন। আমায় এখুনি স্টেশনে পেঁছতে হবে।

গুরচরণ ঃ পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে। এখনি আসছি।

(রাজিন্দরকে চেয়ারে বসিয়ে নিজে ভেতরের ঘরে চলে যায়)

সন্ধু ঃ মিস্ সেখোঁ, আপনার ভাইয়ের খুব ভাগ্য ভালো।

রাজিন্দর ঃ বৌদি কেমন হয়েছে ?

সন্ধু ঃ ড্যাম বিউটিফুল।

রাজিন্দর ঃ শুনে যা ভালো লাগছে না, কি বলবো।

সন্ধু ঃ অনেকবার বলেছে আমার আদরের বোনকে বলিস—

রাজিন্দর ঃ কি ?

সন্ধু ঃ ও যেন বিয়ে করে নেয়।

রাজিন্দর ঃ আমার বোন এখুনি বললো যে, বিয়ে করব না।

সন্ধু ঃ ও তো কোনো কারণ বলেনি। আপনিই বলুন, সেখোঁকে গিয়ে তো আবার সব বলতে হবে।

রাজিন্দর ঃ কারণ কিছু না, এমনি—

সন্ধু ঃ বেশ। কিন্তু বিয়ে না করার কারণ নিশ্চয়ই আছে, যখন মেয়ে নিজে থেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিয়ে করবে না বলে, তখন কারণ একটা থাকা উচিত।

রাজিন্দর ঃ আপনি বলবেন যে মেয়েটির সঙ্গে আমি থাকি তার ভাই-বোন কেউ নেই। বাবা-মাও না। ওকে ওর কোনো আত্মীয় মানুষ করেছে, পড়িয়েছে। ও আমার জন্যে বিয়ে করবে না আর আমিও ওর জন্যে সারাজীবন কুমারী থাকতে রাজী আছি।

সন্ধু ঃ (মুচকি হেসে) বাহ্ বেশ। (দীর্ঘশ্বাস নিয়ে) আমি আর সেখোঁও এমনি বলাবলি করতাম কিন্তু ঐ মেম আসার পর···যাক্‌গে। সেখোঁ খুশী, আমিও। আমিও বিয়ে করতেই বার্মিংহাম থেকে এখানে এসেছি। (যেন হঠাৎ কি মনে পড়ে) ওহ্ হো, আপনার উপহারগুলো দিতে ভুলেই গেছি। এই নিন, এটা ঘড়ি। (জার্সির পকেট থেকে বের করে দেয়) তাড়াতাড়ি হাতে বেঁধে নিন।

রাজিন্দর ঃ একটা তো বাঁধাই রয়েছে।

(সন্ধু হাসে)

সন্ধু ঃ (আঙুল থেকে খুলে) এই নিন, সোনার আংটি। কিছু

মনে করবেন না, আঙ্‌ুলে পরে না এলে আনতেই দিত না।

রাজিন্দর : তাতে কি হয়েছে ?

সন্ধু : আঙ্‌টিটা মাঝের আঙ্‌ুলে ঠিক হবে। একটু পরে দেখুন।

রাজিন্দর : ঠিক আছে, পরে পরবো। এখন নয়।

সন্ধু : এখন নয়। (হাসে) বেশ, ঠিক আছে। (এ্যাটাচি থেকে কিছু টাকা বের করে) এই নিন, একশো টাকার দশটা নোট।

রাজিন্দর : কি বলছেন আপনি ?

সন্ধু ঃ মিস্ রাজিন্দর, মানি ম্যাটারে লজ্জা করতে নেই। সেখোঁর উপহার আপনাকে পৌঁছে দিতে পেরেই আমি খুশী। হুঁ, একটা কথা বলি, আমি না আমার ভাবী বৌয়ের জন্যেও অনেক কিছু যোগাড় করে এনেছি।

রাজিন্দর ঃ তাই নাকি।

সন্ধু : এই ঘড়ি, দুটো আঙ্‌টি, পেন, গয়না, পার্স, রুমাল আর রেডিমেড স্যুট।

রাজিন্দর : (আশ্চর্য হয়ে) রেডিমেড স্যুট !

সন্ধু : হ্যাঁ, ওখানে অনেক পাওয়া যায়।

রাজিন্দর : না আমি বলছিলাম আপনার ভাবী বৌয়ের যদি ফিট না করে তো—

সন্ধু : লম্বা হয়ে গেলে ছোট করিয়ে নেব, আর যদি ছোট হয় তো—তো না লম্বা করাবো না। নতুন বউকে জোড়াতালি দেওয়া কাপড় পরাতে ইচ্ছে করে না।

(রাজিন্দর মুচকি হাসে)

সন্ধু : মিস্ রাজিন্দর। কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয় আমার আনা স্যুটগুলো পরবে যে মেয়ে সে আপনার চেয়ে লম্বা হতে পারে না—

রাজিন্দর : (সন্দেহের স্বরে) এ আপনি কি করে বলতে পারেন ?

সন্ধু : আপনি হচ্ছেন "টল এ্যাণ্ড স্লিম", লম্বা আর ছিপছিপে। আমি স্যুট এমনি কোনো মেয়ের জন্যেই এনেছি।

রাজিন্দর : (খোলা গলায়) লম্বা ছিপছিপে মেয়ে আপনার কেন

পছন্দ ?

সন্ধু : কেননা যখন ও হাঁটে তখন মনে হয় আকাশে উড়ন্ত ঘুড়িকে যেন কেউ ধীরে ধীরে টানছে। যখন ও হাসে তখন ওর গালে আমি সুন্দর টোল পড়তে দেখি। আমার রামধনু খুব ভালো লাগে। ছাড়ুন এসব কথা। আপনি কিন্তু এখনো আঙটিটা পরেননি।

রাজিন্দর : ইচ্ছে করছে না আমার।

সন্ধু : ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আমার যে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে।

রাজিন্দর : কি করবেন দেখে ?

সন্ধু : মেয়েরা যখন সাজে তখন তারা ভালো করেই জানে এ সাজার মানে কি ?

রাজিন্দর : ইংল্যাণ্ডে থেকে আপনার মেয়েদের সাইকলজি সম্বন্ধে জ্ঞান হয়েছে মনে হচ্ছে।

সন্ধু : ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের বোঝা শক্ত নয়। ভারতীয় মেয়েরাই বেশী জটিল।

(দুজনেই হেসে ওঠে)

রাজিন্দর : (সোজাসুজি) আপনি বিয়ে করছেন কবে ?

সন্ধু : খুব তাড়াতাড়ি। একেবারে চটপট। সঙ্গেসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের দুটো সীটও বুক করাবো।

রাজিন্দর : ইংল্যাণ্ডে না গেলে আপনার চলবে নাকি ?

সন্ধু : ইংল্যাণ্ডে যেতেই হবে। আমি বন্ধুকে আমার পাঞ্জাবী—

রাজিন্দর : (বাঁধা দিয়ে) না ধরুন আপনার যদি এমন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় যে নিজের বন্ধু-বান্ধবী, মা-বাবাকে ছেড়ে যদি না যেতে চায় তাহলে ?

সন্ধু : হুঁ, এ তো সময় এলে তবেই বলা যায়।

রাজিন্দর : বিয়ের জন্য অনেক রকম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

সন্ধু : সে তো ঠিক। জীবনে কিছু দিলে তবেই কিছু পাওয়া যায়।

রাজিন্দর : কথায় কথায় ঘড়িটা হাতে বেঁধে নিয়েছি।

সন্ধু : খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। হাত সাজাতে আমাদের মেয়েরাই

জানে। বিদেশী মেয়েরা সব শক্তি...এবার আঙটিটাও পরে নিন।

রাজিন্দর : মাঝের আঙ্‌ুলটায় একেবারে ফিট করেছে।

সন্ধু : আমি ঠিক বলেছি। (দুজনেই হাসে)

রাজিন্দর : তাহলে আপনি শিগ্‌গীরই বিদেশে ফিরে যাচ্ছেন ?

সন্ধু : বিয়ের পরই সব প্রোগ্রাম হবে।

রাজিন্দর : মাঝের আঙ্‌ুলটায় আঙ্‌টিটা সুন্দর লাগছে।

সন্ধু : হ্যাঁ, দারুন সুন্দর।

(ভেতর ঘর থেকে গুরচরণ ফলের প্লেট নিয়ে আসে)

গুরচরণ : তোর হাতে ঘড়িটা কি সুন্দর লাগছেরে সখী!

সন্ধু : (আশ্চর্য) সখী!

গুরচরণ : হ্যাঁ, আমি ওকে ঐ বলেই ডাকি, ও আমার সখী, প্রাণের মতো প্রিয় সখী।

সন্ধু : (হেসে) হ্যাঁ, বুঝি বুঝি।

গুরচরণ : তোর আঙ্‌ুলে আঙ্‌টিটা সুন্দর লাগছে।

রাজিন্দর : (ঘাবড়ে গিয়ে) এটা এমনি পরেছি। খুলতে গিয়ে—

গুরচরণ : পাগ্‌লী কোথাকার। থাকতে দে না।

রাজিন্দর : (উঠতে উঠতে) আমি এখুনি আসছি।

(পিছনের ঘরে দিকে ঘোরে)

গুরচরণ : কোথায় যাচ্ছিস ?

রাজিন্দর : (যেতে যেতে) এক্ষুণি আসছি। (গুরচরণ হাসে)

গুরচরণ : ভীষণ লাজুক। (সন্ধু হাসে)

সন্ধু : আপনাদের জুড়িটাও বেশ। একরকম চেহারা, একইরকম সাজ-পোষাক, ধরণ-ধারণ।

গুরচরণ : আমাদের দু'জনেরই প্রায় সব জিনিস একই রকম।

সন্ধু : দু'জনের এই মিল আপনারা করলেন কি করে ?

গুরচরণ : মনের ব্যাপার! যখন মন এক হয়ে যায় তখন আর সব শেষ—

সন্ধু : একদম ঠিক। কিন্তু— (নাম ভুলে যায়)

গুরচরণ : গুরচরণ ?

সন্ধু : থ্যাঙ্কু। আমি বলছিলাম মিস্ গুরচরণ, আমি আর সেখোঁও এমনি একাত্ম ছিলাম। কিন্তু ও (উদাস স্বরে) একদিন চুপিচুপি বিয়ে করে নিলো।

গুরচরণ : (ব্যঙ্গাত্ম হাসি হেসে) বিয়ে!

সন্ধু : আমার প্ল্যান ছিলো ব্যাচেলার থাকার।

গুরচরণ : তখন আপনারও রাগ চড়ে গেল।

সন্ধু : রাগ নয় মিস্ গুরচরণ।

গুরচরণ : সমাজের সামনে আদর্শবাদী হতে চাইছেন।

সন্ধু : না তাও না।

গুরচরণ : বিয়ে করতে আপনাকে সমুদ্র পেরিয়ে এখানে আসতে হলো ?

সন্ধু : দেখুন, আমার মনে হয় বিয়ের চিন্তা মানুষের মনে তেমনিই জন্মায়, যেমন করে জন্ম হয় খাওয়া-দাওয়া, জাগা-ঘুমানোর, চলা-ফেরার, হাসি-গানের চিন্তা।

গুরচরণ : (ব্যঙ্গাত্মক স্বরে) চিন্তা!

সন্ধু : আপনি একটু ভেবে দেখুন, আপনার—

গুরচরণ : (কথার মাঝে) বিয়ে একটা চিন্তা, ধারণা মাত্র। কেউ এটাকে টেনে হিঁচড়ে একটা বই লিখতে পারে, কেউ এটাকে সংক্ষিপ্ত শব্দে নিয়ে আসতে পারে—যেটা অশুদ্ধ বলে মুছে দেওয়া হয়।

সন্ধু : আমার কিন্তু এখনও তাই ধারণা। বিয়ের চিন্তাটাকে মুছে দিলেই মোছে না। সেটা চেপে নিশ্চয়ই রাখা যায়। কিন্তু যখন সেটা বেরিয়ে পড়ে স্বরূপে তখন তার চেহারাটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো লাগে।

গুরচরণ : (ব্যঙ্গাত্মক হাসি) ক্ষুধার্ত নেকড়ে।

সন্ধু : যতো দিন বাঘের বয়স থাকে ততো দিন সে যা খুশী করতে পারে, কিন্তু যখন ওর নখের ধার চলে যায়, দাঁত পড়ে যায় তখন—

গুরচরণ : (কথার মাঝেই) আপনি কিছু খেয়ে নিন। (সন্ধু প্লেট উঠিয়ে নেয়)

সন্ধু : আপনিও নিন।

(গুরচরণও প্লেটের দিকে হাত বাড়ায়)

সন্ধু : সৃষ্টির নিয়মই হচ্ছে প্রত্যেকের আর এক জনকে প্রয়োজন।

গুরচরণ : রাজিন্দর সব সময় আমায় সঙ্গ দেয়।

সন্ধু : আপনারা দু'জনেই ভাগ্যবতী।

গুরচরণ : আপনার বিয়ে কবে ?

সন্ধু : খুব তাড়াতাড়িই।

গুরচরণ : কোথায় ?

সন্ধু : এখনো কোথাও ঠিক হয়নি। আপনিই বলুন ?

গুরচরণ : আমি বলবো ? (ঘাবড়ে গিয়ে) আমি···আমি কি বলবো ? আমি কি ম্যারেজ ব্যুরো নাকি ?

(সন্ধু হাসে, গুরচরণও। রাজ ভিতরে আসে)

সন্ধু : আসুন মিস রাজ।

গুরচরণ : কিরে খুলে এলি কেন ?

রাজিন্দর : খুলেছিলাম। কিন্তু আবার পরে নিয়েছি।

(সন্ধু আর গুরচরণ হাসে)

সন্ধু : (ঘড়ি দেখে) ওহ্ হো, আমার গাড়ী বোধহয় স্টেশানে এসে গেল আচ্ছা, এবার অনুমতি করুন, আসি। (এ্যাটাচি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়) আমি আপনাদের আমার ঠিকানাটা দিয়ে যাচ্ছি। (পকেট থেকে কার্ড বের করে ওদের দিকে এগিয়ে দেয়) আপনাদের দু'জনকে খুব ভালো লাগলো। দু'জনের মধ্যে যে কেউ যদি আমায় বিয়ে করতে রাজী থাকেন তাহলে এই ঠিকানায় চিঠি দেবেন। পনেরো দিন পর্যন্ত আপনাদের চিঠির অপেক্ষা করব। তারপরে না। (কার্ডটা টেবিলের ওপর রাখে) বাই-বাই।

(সন্ধু দ্রুত বেরিয়ে যায়। দু'জনেই ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে, চুপ করে বসে থাকে)

গুরচরণ : সখী !

রাজিন্দর : হুঁ।

গুরচরণ : আমাদের মনে কেমন যেন একটা হয়ে গেছে।

রাজিন্দর : হ্যাঁ।

গুরচরণ : ও তো যাওয়ার জন্যেই এসেছিল।

রাজিন্দর : ও এ্যাড্রেস রেখে গেছে।

গুরচরণ : কি হবে ওটা ?

রাজিন্দর : ওটা জানলা দিয়ে ফেলে দে।

গুরচরণ : এখানে পড়ে থাকলেই বা আমাদের ক্ষতি কি ?

রাজিন্দর : হ্যাঁ, কাল সকালে তো আমরাও চলে যাব।

গুরচরণ : কোনো নতুন ভাড়াটে আসবে। এটা বাজে কাগজ দেখে ফেলে দেবে।

রাজিন্দর : তার চেয়ে ভালো এটা আমরা সঙ্গে নিয়ে যাই।

গুরচরণ : হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমাদের কাছে রাখলেইবা কি এসে গেল।

(দু'জনেই কার্ডটার দিকে হাত বাড়ায়
সঙ্গে সঙ্গে পর্দা নামে)

লেখক-পরিচিতি

1. **ঈশ্বরচন্দর নন্দা** (1892-1966)

জন্ম : 30 সেপ্টেম্বর 1892, গ্রাম গাঁধিয়া পুনিয়াড়, জেলা গুরদাসপুর।

শিক্ষা : ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ., দয়াল সিং কলেজ, লাহোর। এফ. সি. কলেজ, লাহোর এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি।

পেশা : অধ্যাপনা, পাঞ্জাব শিক্ষা বিভাগ, 1947-এ অবসর গ্রহণ।

মৃত্যু : 2 সেপ্টেম্বর 1966-র রাত্রি, দিল্লীতে।

প্রথম পাঞ্জাবী একাঙ্ক 'ডুল্‌হন'। 1913 খৃস্টাব্দে রচিত ও দয়াল সিং কলেজ লাহোরে মঞ্চস্থ।

নাটক : সুভদ্রা (9120): শামু শাহ (1928)— (সেক্সপীয়ারের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' অবলম্বনে) : বরধর (1928)।

একাঙ্ক সঙ্কলন : ঝলকারে, লিশকারে, চমকারে। ঈশ্বরচন্দর নন্দা আধুনিক নাটকের এবং রঙ্গমঞ্চের নতুন রীতির প্রবর্তক। নাট্যরচনা, অভিনয়, এবং নির্দেশনা এই তিন বিভাগেই নন্দাজীর দান ঐতিহাসিক ও শৈল্পিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীনতার প্রভাবে নন্দা সমাজ-সংস্কারকে নাটকের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তা নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে যোগ করেছেন। কিন্তু তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সহজ এবং সুস্থ মনোরঞ্জন।

ঈশ্বরচন্দর নন্দার সৃষ্ট চরিত্ররা তাদের সমকালের প্রতিনিধিত্ব করে। এদের মধ্যে রয়েছে সুদখোর শাহ, অন্ধবিশ্বাস ও প্রাচীন রীতির শিকার ঋণগ্রস্ত মানুষ, ভণ্ড সাধু, গৃহহারা অসহায় গৃহস্থ, বাল্যবিবাহের বলি অবলা মেয়েরা, ইংরাজীয়ানার উপাসক নতুন নবাব, স্বার্থান্বেষী মানুষ, ঘুষখোর অফিসার এবং লোভী ব্যবসায়ী। এসব চরিত্রগুলি দক্ষভাবে এবং সুকৌশলে রচিত।

নন্দা ব্যক্তিচরিত্র নয়, প্রতিনিধি চরিত্রই সৃষ্টি করেছেন। নন্দার

চরিত্ররা সামাজিক স্তরে নিন্দনীয় অথবা নৈতিক দিক দিয়ে পতিত। তাঁর প্রেরণাস্রোত সর্বদাই ব্যঙ্গ বা পরিহাস রূপেই প্রবাহিত হয়, দ্বেষ হিসেবে নয়। এতে খলনায়কের মানবতাই বড় হয়ে যায় না, বরং তারা পাঠক ও দর্শকদের সহানুভূতি অর্জন করে নেয়। চরিত্রগুলি ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হয়েছে এবং সংলাপ বাস্তবানুভাব—সোজা তীক্ষ্ণ এবং মনোরঞ্জক।

2. সন্ত সিং সেখোঁ (1908 —)

জন্ম : 30 মে 1908, চক নম্বর 70, জেলা লায়লপুর (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত)। পৈতৃক গ্রাম দাখা, জেলা-লুধিয়ানা।

শিক্ষা : এম. এ. (ইংরাজী সাহিত্য, অর্থশাস্ত্র), এফ. সি. কলেজ, লাহোর।

পেশা : অধ্যাপনা। 1931-1951 পর্যন্ত খালসা কলেজ, অমৃতসরে অর্থশাস্ত্র, ইংরাজী ও পাঞ্জাবীর অধ্যাপক। 1951-61 পর্যন্ত খালসা কলেজ, সুধারের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। 1961-71 পর্যন্ত মাতা গুজরী কলেজ, ফতেহগড় সাহেব, খালসা কলেজ, পাতিয়ালা ও গুরু গোবিন্দ সিং রিপাব্লিক কলেজ, জণ্ডিয়ালার প্রিন্সিপাল। মাঝে মাঝে ইংরাজী সাংবাদিকতা। প্রায় পাঁচ বছর লোক-নির্মাণ বিভাগে ঠিকাদারী ও সরকারী কাজ করেন। 1971-এর আগস্টে জণ্ডিয়ালা থেকে অবসর নিয়ে পড়াশোনার সাথে সাথে চাষাবাদের দেখা-শোনাও করেন।

প্রকাশিত নাটক : 'কলাকার' (1946), 'নারকী' (1953), 'মোইয়া সার ন কাই', 'বারিস', 'বেড়া বন্ধ না সকিয়ো', 'ভূমিদান' (1954), 'সিঁয়লো দি নদ্দী', 'দময়ন্তী' (1964), 'মিত্তর প্যায়া' (1970)। শেষোক্ত নাটকটির জন্য নাট্যকার আকাদেমী পুরস্কার পান।

একাঙ্ক সঙ্কলন : 'ছে ঘর' (1940), 'তাপিয়া কিঁউ খাপিয়া', 'নাটস্নেহে'।

অনুবাদ : ম্যাক্‌বেথ।

সন্ত সিং সেঁখো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সমালোচক হিসেবে খ্যাতি হলেও পাঞ্জাবী গদ্য (লঘু রচনা ও উপন্যাস), নাটক এবং কাব্যের

জগতেও তাঁর প্রভূত দান রয়েছে। প্রধানত ইনি গদ্য এবং নাটক ছাড়াও ভাষাবিজ্ঞান, পাঞ্জাবী সাহিত্যের ইতিহাস, পাঞ্জাবী শব্দকোষ, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ইংরাজীর ধরনের বিভিন্ন সাহিত্য অনুবাদ করেছেন। পাঞ্জাবী ভাষায় প্রত্যেক বিষয়ে চিন্তাশীল লেখক হিসেবে সেঁখো অন্যতম।

পাঞ্জাবী নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাটকের প্রধান আকর্ষণ নাটকীয় ঘটনা ধরবার গতি অথবা সুন্দর সংলাপই এক অনন্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য জিজ্ঞাসা তাঁর নাটককে গতিময় করে। মানুষের বাহ্যিক সংঘর্ষ এবং তাঁর থেকে উদ্ভূত আবেগ তাঁর নাটকে গৌণ হয়ে যায়।

তীক্ষ্ণ যুক্তিময় জ্ঞানের আলোকে নাটকীয় চরিত্র এবং নিজেকে বোঝার প্রচেষ্টার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের অর্থের খোঁজই তাঁর রচনার মূল প্রেরণা। তিনি সমালোচক হিসেবে যুক্তিনিষ্ঠভাবে সমাজবাদী দর্শনকে বোঝার চেষ্টা করেছেন অন্যদিক সৃষ্টিশীল রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির ও চিন্তার বিস্তার করেছেন। সাম্যবাদী দর্শনের সঙ্গে তিনি নিজের রচনায় পাশ্চাত্য সমাজশাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানকেও রচনার ভিত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সন্ত সিং সেখোঁর নাট্যকলার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তিনি ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী ও মধ্যযুগীয় ভারত (বিশেষ করে পাঞ্জাব)-এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পৌরাণিক কাহিনী ('কলাকার'-এ ইন্দ্র ও অহল্যার কথা এবং 'দময়ন্তী'তে নল-দময়ন্তীর কাহিনী), মধ্যযুগীয় ইতিহাস ('বেডা বঁধু ন মোইয়া', 'মোইয়া সার ন কাই') এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস ('সিয়লো দি নদ্দী' এবং 'বারিস')-কে আশ্রয় করে সমকালীন দৃষ্টি চিন্তা ও বিশ্লেষণই তাঁর নাট্য-সাধনার নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। এর সুবিধা হল কোনো সমকালীন সমস্যাকে ঐতিহাসিক ঘটনার পুনঃস্থাপিত করলে তাকে একটা বৃহত্তর পরিপেক্ষিত দেওয়া এবং তাকে গভীর চিন্তার ছাপ রাখার সুযোগ হয়।

সন্ত সিং সেখোঁ তার নাটকগুলিতে মঞ্চস্থ করার দিকে বিশেষ নজর

দেননি। সেগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লে এক বিশেষ মানসিক তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব।

3. গুরদয়াল সিং খোসলা (1912 —)

জন্ম ঃ 15 জানুয়ারী 1912, লাহোর।

শিক্ষা ঃ এম. এ. (ইংরাজী সাহিত্য), গভর্নমেণ্ট কলেজ, লাহোর।

পেশা ঃ খালসা কলেজ, অমৃতসরে এক বছর অধ্যাপনা করার পর দক্ষিণ-পশ্চিম রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পদ থেকে অবসর নিয়ে পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয় পাতিয়ালাতে বক্তৃতা দেন ও দু'বছর নাটক বিভাগের উপদেষ্টা থাকেন। বর্তমানে দিল্লীতে পাঞ্জাবী থিয়েটার সংস্থার প্রযোজক।

প্রকাশিত রচনা ঃ 'বুহে বৈঠি ধীঁ' (1950), 'মর মিটন ওয়ালে', 'পরলো তোঁ পহিলোঁ'।

একাঙ্ক সঙ্কলন ঃ 'বেধরে', 'সতারওয়াঁ পতি'।

অনুবাদ ঃ 'চাঁদী দা ডিব্বা' (গলস্ওয়ার্দির 'সিলভার বক্স')

গুরদয়াল সিং খোসলার দৃষ্টি প্রধানত কেন্দ্রীভূত হয়েছে নাগরিক জীবনের সমস্যা ও বৈষম্যের দিকে যা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। মধ্যবিত্তের গার্হস্থ্যজীবন এবং আচার-বিচারের সঙ্কীর্ণতা এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলি খোসলা দক্ষতার সঙ্গে উন্মোচিত করেছেন। সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরতে তিনি সিদ্ধহস্ত। এই জন্যেই তাঁর নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রসধারা প্রবহমান থাকে।

নাট্যরচনার থেকে তিনি বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে তার দানের জন্যে। অবিভক্ত পাঞ্জাবে লাহোরের লিটল থিয়েটার গ্রুপের সক্রিয় সদস্য ছিলেন খোসলা। স্বাধীনতার পর তিনি দিল্লীতে পাঞ্জাবী থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন। যার ফলে রাজধানীতে পাঞ্জাবী নাটক সম্মানিত হয়। চাকরীর প্রয়োজনে যেখানেই তিনি গেছেন সর্বত্রই সঙ্গে গেছে পাঞ্জাবী নাটক। সম্প্রতি দিল্লীতে পাঞ্জাবী থিয়েটার গ্রুপের পুনঃস্থাপনা করে নাট্যোন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছেন।

4. হরচরণ সিং (1914 —)

জন্ম ঃ 10 ডিসেম্বর 1914। চক নং 576, শেখপুর জেলা। (পশ্চিম পাঞ্জাব, পাকিস্থান), পৈতৃক গ্রাম চকদানা, জলন্ধর।

শিক্ষা ঃ এম. এ. (ইতিহাস, পাঞ্জাবী), খালসা কলেজ, অমৃতসর, এফ. সি. কলেজ এবং দয়াল সিং কলেজ লাহোর, পি.এইচ. ডি., দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।

পেশা ঃ অধ্যাপক, সম্প্রতি পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়, পাতিয়ালায় পাঞ্জাবী বিভাগের অধ্যক্ষ।

প্রকাশিত রচনা ঃ

নাটক ঃ 'কমলা কুমারী' (1937), 'রাজা পোরাস' (1939), 'দূর তুরাস্তে শাহিরেঁা', 'খেডন দে দিন চার', 'অনজোড়', 'দোষ', 'পুন্নিয়া দা চন্ন', 'রাত্তা সালু শোভা শক্তি', 'কঞ্চন মাটী', 'ইতিহাস জবাব মাঁগদা হৈ', 'কল অজ্জ অতে ঝলক'।

একাঙ্ক সঙ্কলন ঃ 'জীবন লীলা' (1940), 'সপ্তঋষি', 'পঞ্জ গীটড়াঁ', 'পঞ্চ পরধান', 'মুড়কে দি খুশবোঁ', 'চমকৌর দী গাড়ী'।

হরচরণ সিং সুখ্যাত ঈশ্বরচন্দর নন্দার নাট্যশৈলীর উত্তরাধিকারী। তাঁর নাটকে প্রধানত সাম্যবাদ ও মানবোত্থানের কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। উনি কিছুদিন যাবৎ ঐতিহাসিক বিষয়েও লেখা শুরু করেছেন। সমাজসংস্কার ও ব্যক্তিকল্যাণ সম্পর্কিত রচনাগুলি সরল ও স্পষ্ট। তাঁর রচনায় গ্রামীন সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং নগর-জীবনের প্রতি সন্দেহ ফুটে ওঠে।

পাঞ্জাবী নাটকে তিনি যোগদান করেছেন সবচেয়ে বেশী। আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি গম্ভীর সন্ত্রাসমূলক রচনা করলেও সামাজিক অবস্থা ও সমস্যার প্রতি তাঁর দৃষ্টি সব সময়েই কেন্দ্রীভূত ছিল। সম্ভবত সরলতা এবং সামাজিক অবস্থার ব্যবহারের জন্যে তাঁর নাটক অত্যধিক জনপ্রিয়।